পেট্রোলিয়ম

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

পেট্রোলিয়ম

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই আজও খুব বেশি লেখা হয়ে ওঠে নি। কারণ বোধ করি, সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এখনও গড়ে ওঠে নি। অনেক পারিভাষিক শব্দ এখন প্রচলিত হয়েছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি সহজবোধ্য নয় এবং সমুচিত অর্থবোধকও নয়। তাই অনেক সহজ বৈজ্ঞানিক তথ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশ ক'রে আরও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে। এই পুস্তিকা-রচনায় আমাকে অনেক সময় এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। পারিভাষিক শব্দ অধিকাংশই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' এবং শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'চলন্তিকা' থেকে বেছে নিয়েছি। কয়েকটি শব্দ নিজে রচনা করে নিয়েছি।

এই পুস্তিকা-রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়। এই সুযোগে এঁদের অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করছি। চিত্রশিল্পী শ্রীমনুজপ্রসাদ গুহ দুটি ছবি এঁকে দিয়েছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লেখক

সূচী

। মলাট-চিত্র ।

ডিগবয় তৈলখনির একটি কূপ। বর্মা শেলের সৌজন্যে প্রাপ্ত

পৃথিবীর পেট্রোলিয়ম-বহুল চারটি অঞ্চল

১ ক্যালিফোর্নিয়া
মেক্সিকো কলম্বিয়া

২ রাশিয়া
রুমানিয়া ইরাক

৩ আসাম
ব্রহ্মদেশ

৪ সুমেরুবৃত্ত
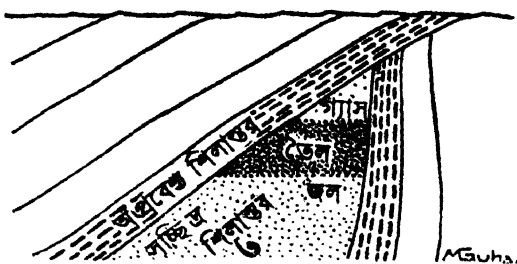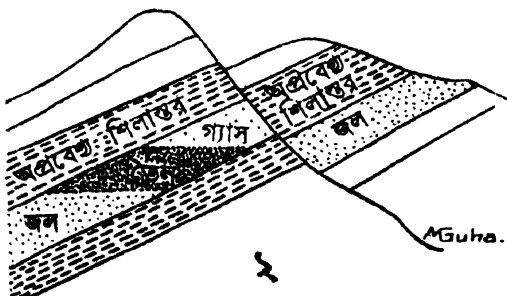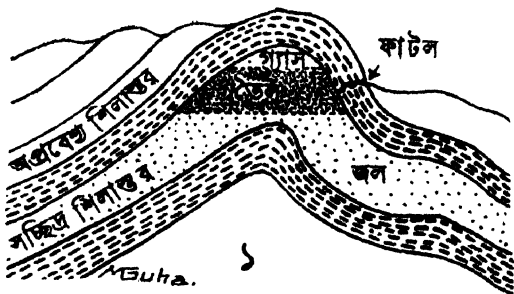
ভূগর্ভে তৈল-সঞ্চয়-স্থানের শিলাস্তরের নানাপ্রকার গঠনরীতি

১. প্রারম্ভ

পেট্রোলিয়ম বলতে খনিজ তেল বোঝায়। আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন মোটর-গাড়ি বিমানপোত কলকারখানা এঞ্জিন, আরও কত কি। এদের সচল রাখতে হলে চাই জ্বালানি তেল— তার উৎস হল পেট্রোলিয়ম।

মাটির অনেক নীচে বালুর স্তর থেকে পেট্রোলিয়ম তোলা হয়। কাদাগোলা দুর্গন্ধ ঘোলাটে জলের মত অপরিষ্কার ও তরল অবস্থায় পেট্রোলিয়ম উঠে আসে। তখন এর রং কালো বা বাদামি গোছের থাকে। এর সঙ্গে নির্গত হয় প্রচুর দাহ্য গ্যাস। এ ছাড়া কর্দমজাত শেল (shale) তৈলবাহী হলে তা থেকেও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পেট্রোল জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

ভারতে পেট্রোলিয়মের একান্ত অভাব। পূর্বে পাঞ্জাবের আটক এবং আসামের ডিগবয় অঞ্চলের খনি থেকে বছরে প্রায় ১২ কোটি গ্যালন তেল পাওয়া যেত। কিন্তু ভারত-বিভাগের পর আটক-অঞ্চল পাকিস্থানের অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদের পেট্রোলিয়ম-সম্পদে খুবই ঘাটতি পড়েছে। আসামের ডিগবয়-খনি থেকে যে পরিমাণ পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায় তা দেশের প্রয়োজনের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ মাত্র। ঘাটতির ৭৪ ভাগ আমদানি করা হয় ইরান থেকে। গত কয়েক বছর ভারতে কি পরিমাণে পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদি আমদানি করা হয়েছে তার হিসেব পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল—

তালিকা ১। পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদির আমদানি (১৯৪৯-৫২)

	১৯৪৯-৫০		১৯৫০-৫১		১৯৫১-৫২	
	পরিমাণ (লক্ষ গ্যালনে)	মূল্য (লক্ষ টাকায়)	পরিমাণ (লক্ষ গ্যালনে)	মূল্য (লক্ষ টাকায়)	পরিমাণ (লক্ষ গ্যালনে)	মূল্য (লক্ষ টাকায়)
পেট্রোল ইত্যাদি	১৬৮৪	১৫৫৩	১৮২৭	১৭১১	২৪১০	২৩৪৪
কেরোসিন	১৮৯৭	১৪৪১	২১৫০	১৬৬৪	২৪০০	১৮১১
অন্যান্য জ্বালানি তেল (ডিজেল তেল ইত্যাদি)	৩১৭৪	১২০৮	৩০৫৭	১০৭৬	৩৪৫৯	১৩৮৭
লুব্রিকেটিং (পিচ্ছিলকারী) তেল	৫৩৭	৭৬৩	৩৭৯	৬৩৭	৪৪৫	৯৬৩
মোট=	৭২৯২	৪৯৬৫	৭৪১৩	৫০৮৮	৮৭১৪	৬৫০৫

২. বিভিন্ন দেশজাত পেট্রোলিয়ম

পেট্রোলিয়ম-উৎপাদন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয় আমেরিকায়। তার পর হয় রাশিয়া ভেনেজুয়েলা মেক্সিকো আর ইরানে। এক বছরের হিসেব দেখলে কথাটা বোঝা যাবে। ১৯৪৪ সালে বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়ম উত্তোলন করা হয়েছিল কম নয়— সমগ্র আমেরিকাতেই ২০৮৮১'৩৯ লক্ষ ব্যারেল বা পিপে, সে স্থলে ইরানে মাত্র ১০২০ লক্ষ ব্যারেল, আর রাশিয়ায় ২৭৫০। এক ব্যারেলের পরিমাপ হল ৪২ গ্যালন।

তালিকা ২। ১৯৪৪ সালে বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়ম-উৎপাদনের পরিমাণ

দেশ	মোট উৎপাদন (লক্ষ ব্যারেল বা পিপে হিসেবে)	পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ভাগ
উত্তর আমেরিকা		
যুক্তরাষ্ট্র	১৬৭৮২·৬৪	৬৪·০১
মেক্সিকো	৩৬০·০০	১·৩৮
ত্রিনিদাদ	২৫০·০০	০·৯৫
কানাডা	১০০·০০	০·৩৮
অন্যান্য দেশ	২·০০	০·০১
মোট =	১৭৪৯৪·৬৪	৬৬·৭৩
দক্ষিণ আমেরিকা		
ভেনেজুয়েলা	২৬৭০·০০	১০·১৮
আর্জেন্টিনা	২৪২·০০	০·৯২
কলম্বিয়া	২৩৫·০০	০·৯০
পেরু	২১০·০০	০·৮০
অন্যান্য দেশ	২৯·৭৫	০·১২
মোট =	৩৩৮৬·৭৫	১২·৯২
ইউরোপ		
রাশিয়া	২৭৫০·০০	১০·৪৯
রুমানিয়া	৩০০·০০	০·৭৬
অন্যান্য দেশ	১৫৩·৪৫	০·৯৭
মোট =	৩২০৩·৪৫	১২·২২

দেশ	মোট উৎপাদন (লক্ষ ব্যারেল বা পিপে হিসেবে)	পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ভাগ
আফ্রিকা	৯০·২৫	০·৩৪
এশিয়া		
ইরান	১০২০·০০	৩·৮৯
ইরাক	৩৩০·০০	১·২৬
বেরিন দ্বীপ	৮৭·৫০	০·৩৩
ভারতবর্ষ	৩০·০০	০·১২
ব্রহ্মদেশ	১০ ০০	০·০৪
নেদারল্যাণ্ড	৩৫০·০০	১ ৩৩
বোর্নিও	৫৫·০০	০·২১
জাপান	৩৫·০০	০·১৪
অন্যান্য দেশ	১২৪·০০	০·৪৭
মোট=	২০৪১·৫০	৭·৭৯

৩. পেট্রোলিয়ম-শিল্পের ইতিহাস

বলতে গেলে পেট্রোলিয়ম-জাতীয় পদার্থের ব্যবহার অনেক কাল থেকেই চলে আসছে। খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে ইউফ্রেটিস উপত্যকার সুমারিয়ানরা অ্যাস্‌ফাল্ট ব্যবহার করত। ইরান-দেশে অ্যাস্‌ফাল্টের ব্যবহার শুরু হল এর প্রায় পাঁচ শ বছর পরে। মিশর-দেশে শব সংরক্ষণের জন্য আচ্ছাদন-বস্ত্র তরল বিটুমেনে (bitumen) ভিজিয়ে নেওয়া হত।

বাইবেলে পেট্রোলিয়ম আর অ্যাস্‌ফাল্টের ব্যবহারের বহু উল্লেখ আছে।

কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে মাটি থেকে উঠে আসা গ্যাসের কথা আড়াই হাজার বছর আগেকার লোকেরাও জানত।

ব্রহ্মদেশের ইনাংজঙ্গ অঞ্চলে তৈলক্ষেত্র আছে বলে জানা গেছে প্রায় হাজার বছর আগে। চীনারা এখানে নল বসিয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তেল তোলবার ব্যবস্থা করেছিল। ৬৬৮ খৃস্টাব্দে জাপানে পেট্রোলিয়ম ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৫৩৫ খৃস্টাব্দে কিউবাতে অ্যাস্‌ফাল্ট আবিষ্কৃত হল। জাহাজের খোলে প্রলেপ দেবার জন্য এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। ১৫৯৫ খৃস্টাব্দে সার্ ওয়াল্টার র‍্যালে ত্রিনিদাদের বিখ্যাত অ্যাস্‌ফাল্ট-হ্রদের বিবরণ প্রকাশ করেন।

পেট্রোলিয়ম শোধন করার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হয় বোধ করি ১৬১৩ সালে। নীৎস্ নামক স্থানে বিজ্ঞানী মাগারা খনিজ তেল আবিষ্কার করেন আর পাতন-প্রক্রিয়ায় তা শোধন করে আলোকপ্রদানকারী তেল রূপে বাজারে বেচেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়লা ও তৈলবাহী শেল (oil shale) থেকে জ্বালানি গ্যাস ও তেল উৎপাদনের চেষ্টা শুরু হয়। ১৭৪৬ সালে বিজ্ঞানী মার্ডক আজকালকার কয়লা-গ্যাস উৎপাদন-প্রক্রিয়ার গোড়াপত্তন করেন। ১৮৪৬ সালে গেস্‌নার নিউব্রুন্‌স্‌উইক থেকে তৈলবাহী শেল সংগ্রহ করেন। তার পর একে চোলাই করে শোধন করে জ্বালানি তেলের অংশ পৃথক করেন আর নাম দেন কেরোসিন (kerosene)। এর অবশ্য অনেক কাল পরে তৈলবাহী শেল থেকে জ্বালানি তেল, পিচ্ছিলকারী তেল (lubricating oil), মোম প্রভৃতি উৎপাদন-প্রণালীর প্রচলন করেন জেম্‌স ইয়ং। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে ইনি cracking বা ভাঙন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেন। তখন থেকে ভারি তেল থেকে হাল্কা জ্বালানি তেল প্রস্তুতির গোড়াপত্তন হয়।

১৮৫৯ সাল। পেট্রোলিয়ম-শিল্পের বিশেষ বছর। পেন্‌সিলভানিয়া রক্

অয়েল কোম্পানির কর্মী বিজ্ঞানী ড্রেক টিটুস্‌ভিল্যাতে ঐবছর তৈলকূপ খনন করেন। সত্তর ফুট খুঁড়তেই তেল পাওয়া গেল এবং দেখতে দেখতে টিটুস্‌ভিলা একটি বিখ্যাত তৈলক্ষেত্রে পরিণত হল। ইয়ং-এর পদ্ধতি সামান্য পরিবর্তন করে প্রধান উপাদানগুলি শোধন করে বাজারে ছাড়া হল। সভ্যজগতে এইসব জিনিসের খুব চাহিদা হল। বিজ্ঞানীরা নানাদেশে পেট্রোলিয়মের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক তৈল-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল।

৪. পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি

রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফের মতে পৃথিবীর শৈশবকালে ভূমির অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপ এবং তাপ মাত্রায় হয়তো বাষ্পের সঙ্গে কার্বাইড অব আয়রন বা কার্বাইড অব ইউরেনিয়মের (carbide of iron or uranium) মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়ে পেট্রোলিয়মের সৃষ্টি হয়েছে। ফরাসি বিজ্ঞানী মোয়াশাঁ অনেক ধাতুজাত কার্বাইড এবং জলীয় বাষ্পের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়ে পরীক্ষাগারে হাইড্রোকার্বন (hydrocarbon) জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি করেন, পরে আর দু জন ফরাসি বিজ্ঞানী সাবাতিয়ে এবং সেণ্ডেরেন্‌স্‌ এইসব হাইড্রোকার্বন হাইড্রোজেনায়িত করে পেট্রোল জাতীয় তরল পদার্থ তৈরি করতে সক্ষম হন।

বিজ্ঞানী এঙ্গলারের মতে সুদূর অতীতে অনেক সামুদ্রিক জীবজন্তু হয়তো মাটির নীচে চাপা পড়েছিল। তারা সুদীর্ঘকাল ধরে অত্যধিক চাপ এবং তাপের প্রভাবে থেকে ক্রমে পেট্রোলিয়মে পরিণত হয়েছে। কৃত্রিম উপায়ে মাছের তেল থেকে পেট্রোলিয়ম জাতীয় পদার্থ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বলে এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য। কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে একসঙ্গে অতটা মাছের তেল অথবা প্রাণীদেহের চর্বিজাতীয় পদার্থের সমাবেশ একরূপ অসম্ভব বলেই

মনে হয়। বরঞ্চ পৃথিবীর শৈশবকালে নানাস্থানে নানাজাতের উদ্ভিদেরই বিরাট সমাবেশ হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। তা ছাড়া প্রাণীদেহে ফস্‌ফোরসের পরিমাণ বেশি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু পেট্রোলিয়মে ফস্‌ফোরসের একান্ত অভাব দেখা যায়। পেট্রোলিয়ম সৃষ্টির ব্যাপারে তেল বা চর্বির চেয়ে প্রোটিন (protein) এবং কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate) জাতীয় পদার্থই যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। কাজেই শুধু প্রাণীদেহ থেকে পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি হয়েছে—এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না।

বিজ্ঞানী পোটনীর মতে অতি প্রাচীনকালে সমুদ্রের ভাসমান নিম্নশ্রেণীর অনেক উদ্ভিদ, যেমন—শ্যাওলা (algae), আর ডাই-এটম্ (diatom), প্লাংক্টন (plankton) প্রভৃতি নানাজাতির নিম্নশ্রেণীর প্রাণী সমুদ্রের তলদেশে জমা ছিল। তারা পচে গলে যাবার আগেই হয়তো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বালুকাস্তরের নীচে চাপা পড়েছিল। তার পর সুদীর্ঘকাল ধরে নানারূপ জীবাণুর ক্রিয়ায় এবং ভূপৃষ্ঠের চাপ ও ভূগর্ভের উত্তাপের প্রভাবে ক্রমে পেট্রোলিয়মে রূপান্তরিত হল। গাছপালা বনজঙ্গল মাটি চাপা পড়ে সুদীর্ঘকাল ধরে ভূপৃষ্ঠের চাপ ও ভূগর্ভের তাপের প্রভাবে কালক্রমে কয়লায় রূপান্তরিত যেভাবে হয়। কয়লার স্তরে জীবাশ্ম (fossil) পাওয়া যায় বলে তার উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব, কিন্তু তরল পেট্রোলিয়মে সেরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয় নি।

বিজ্ঞানী ট্রাইব্‌স্ বিভিন্নদেশের ২৯টি পেট্রোলিয়মের নমুনা পরীক্ষা করে তাদের প্রত্যেকটিতেই সবুজ ক্লোরোফিল ও রক্তের হিমিন-জাত পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা যে সমুদ্রের তলদেশে পুঞ্জীভূত উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়জাতীয় পদার্থের রূপান্তরের ফলেই হয়তো শেষ পর্যন্ত পেট্রোলিয়মের সৃষ্টি হয়েছে।

৫. পেট্রোলিয়মের অবস্থান

খনিজ বিটুমেন নানা অবস্থায় প্রকৃতির বুকে পাওয়া যায় : ১. প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাস, ২. অপরিষ্কার তরল পেট্রোলিয়ম, ৩. অর্ধতরল অ্যাস্‌ফাল্ট, এবং ৪. কঠিন তৈলবাহী শেল।

নিম্নশ্রেণীর অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ সমুদ্রের তলদেশে জমা হবার পর হয়তো বালুকাস্তরের নীচে চাপা পড়ল এবং সুদীর্ঘকাল পরে পেট্রোলিয়মে রূপান্তরিত হল। কাজেই যেসব শিলাস্তরে সমুদ্রের তলদেশের অবস্থার চিহ্ন বিদ্যমান সেখানে পেট্রোলিয়ম থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়। পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে পেট্রোলিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মোটামুটি চারিটি অংশে ভাগ করা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন এইসব অঞ্চলের তৈলবাহী স্তরগুলি এককালে সমুদ্রগর্ভে ছিল—

১. মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চল। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু প্রভৃতি দেশের সুবিখ্যাত তৈল-ক্ষেত্রগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

২. ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত নিম্নাঞ্চল। ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, লোহিত সাগর এবং পারস্যসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে রাশিয়া, রুমানিয়া, ইরান, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশের বিখ্যাত তৈল-ক্ষেত্রগুলি অবস্থিত।

৩. এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্বর্তী দ্বীপপ্রধান অগভীর সমুদ্র অঞ্চল। এই অঞ্চলে অবস্থিত আসাম, ব্রহ্মদেশ, বোর্নিও, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে তৈলবাহী স্তর অবস্থিত।

৪. আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভূ্ত উত্তর মহাসাগর অঞ্চল। এই তুষারাবৃত অঞ্চলে খনিজ তেলের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেলেও আজও সেরূপ ব্যাপক অনুসন্ধান সম্ভব হয় নি। কেবল সুমেরুবৃত্তের মধ্যে একটি তৈলখনি চালু করা সম্ভব হয়েছে।

তরল পেট্রোলিয়ম বা খনিজ তেল বেলেপাথর আর চুনাপাথরের স্তরে সঞ্চিত থাকে। অনেকক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠ থেকে পেট্রোলিয়ম অবস্থানের সব নিদর্শন পাওয়া গেছে অথচ নলকূপ বসিয়ে তেল পাওয়া যায় নি। আবার এমনও দেখা গেছে যে উপরে কোনো নিদর্শন নেই, অথচ ভূগর্ভে প্রচুর পেট্রোলিয়ম সঞ্চিত রয়েছে। এর কারণ পেট্রোলিয়ম তরল পদার্থের ধর্ম অনুযায়ী বালুকাস্তর দিয়ে চুইয়ে অথবা পাথরের ফাটল দিয়ে চুইয়ে উৎপত্তিস্থান থেকে অন্যত্র সরে যায়। উপরে ও নীচে শিলাস্তরের বেষ্টনী থাকলে তবেই পেট্রোলিয়ম উৎপত্তিস্থানে আবদ্ধ থাকে। ভূসংক্ষোভের ফলে হঠাৎ অত্যধিক পার্শ্বচাপে বিভিন্ন শিলাস্তর তরঙ্গায়িত হয়। এইরূপ শিলাস্তরের সবচেয়ে উঁচু অংশের নাম কুব্জভাঁজ (anticline)। এরই নীচে পেট্রোলিয়ম ও গ্যাস জমা হয়। এইসঙ্গে জল থাকলে পেট্রোলিয়ম জলের উপর ভেসে থাকে, কারণ জলের চেয়ে তেল হাল্কা। অনেক-সময় ভূপৃষ্ঠের চাপ অত্যন্ত প্রবল হলে সচ্ছিদ্র বালুকাস্তর দিয়ে বা শিলাস্তরের ফাটল দিয়ে পেট্রোলিয়ম অন্যস্থানে সরে যায়। তার পর আবার সুবিধামত শিলাস্তর পেলে সেখানে জমা হয়; নইলে পাথরের ফাটল দিয়ে ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে আসে। এরূপ হলে পেট্রোলিয়ম-অবস্থানক্ষেত্রে আর পেট্রোলিয়ম-উৎপত্তির কোনো নিদর্শন পাওয়া সম্ভব হয় না। ভূসংক্ষোভ-জনিত স্তরচ্যুতির (fault) ফলে অনেক সময় সচ্ছিদ্র বালুকাস্তরে অবস্থিত পেট্রোলিয়ম শিলাস্তরে এমনভাবে আটকা পড়ে যায় যে তরল পদার্থের ধর্ম অনুযায়ী তা আর অন্যত্র সরে যেতে পারে না। পেট্রোলিয়মের উৎপত্তিস্থান অথবা অবস্থানক্ষেত্র যে-কোনো জায়গাতেই এরূপ স্তরচ্যুতি হতে পারে।

মাটির আগ্নেয়গিরি

মাটির নীচে পেট্রোলিয়ম জমা হবার পর ভূগর্ভের অত্যধিক উত্তাপে ক্রমশ তরল পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়; এইভাবে গ্যাসের আয়তন যত বাড়তে থাকে

ভূগর্ভে চাপের পরিমাণও তত বাড়তে থাকে। এজন্য স্থানবিশেষে তুবড়ির মত বিস্ফোরণ হয় এবং গ্যাস তেল ও কাদামাটি সজোরে বেরিয়ে আসে। আবার কোনো কোনো স্থানে বিস্ফোরণ হয় না, কিন্তু উপরকার মাটি ও শিলাস্তর অনেকটা উপর দিকে ঠেলে উঠে আসে। ভূগর্ভে যেখানে অনেকটা গ্যাস সঞ্চিত হয় তার উপরে পলি-পাথর বা নরম মাটির পুরু ছাদ থাকলে তা ভিতরকার চাপে ক্রমশ উঁচু হয়ে টুপির মত কুব্জপৃষ্ঠ-আকার নেয়। ভূপৃষ্ঠে বালুকাস্তর থাকলে জল-হাওয়ার সংস্পর্শে ক্রমশ বালি সরে যায়। এইভাবে চাপ কমে গেলে টুপির মত শক্ত ছাদটা ক্রমশ আরও উপর দিকে উঠে আসে। গ্যাসের চাপের তুলনায় এই ছাদের এবং আশেপাশের শিলাস্তরের প্রতিরোধ-শক্তি বেশি হলে ভারসাম্য বজায় থাকে। তখন আর বিস্ফোরণ হয় না। এই অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা এরই নাম দিয়েছেন 'মাড্ ভল্‌কানো' বা মাটির আগ্নেয়গিরি। রাশিয়ায় এমন মাটির আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গেছে, যার টুপির মত ছাদটা গ্যাসের চাপে প্রায় ২৫০ ফুট উপরে উঠে এসেছে।

অনেক সময় সমুদ্রের তলদেশ থেকে জলের উপর পর্যন্ত এইরূপ মাটির আগ্নেয়গিরি ঠেলে ওঠে, কিন্তু জলের আঘাতে ক্রমশ মাটি গলে যাবার সঙ্গেসঙ্গে গ্যাস বেরিয়ে যায় আর হঠাৎ-জেগে-ওঠা দ্বীপটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্রহ্মদেশেও অনেক মাটির আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গেছে। আসামের লখিমপুর জেলায় বড়গোলাই নামক স্থানে একটি মাটির আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আসাম অয়েল কোম্পানি এখানে নলকূপ বসান। এই স্থানে গ্যাসের চাপ এত প্রবল ছিল যে, নলকূপ তৈলবাহী স্তরে পৌঁছবামাত্র পেট্রোলিয়ম এত বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে যে প্রথম কিছুদিন নলের মুখে পাম্প বসানোই সম্ভব হয় নি। এখানে প্রচুর দাহ্য গ্যাস এবং পেট্রোলিয়মের অপচয় ঘটে এবং মাত্র দুমাসের মধ্যেই এখানকার পেট্রোলিয়ম-ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়।

৬. ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

পেট্রোলিয়ম কোথায় আছে খুঁজে বের করা বড় কষ্টকর। পাথরের ফাটল দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস অথবা তেল বেরুতে দেখলে সে জায়গায় পেট্রোলিয়মের কূপ আছে বলে অনুমান করা চলে।

ভূবিজ্ঞানীরা স্পর্শকাতর 'টর্সন ব্যালান্স' (torsion balance), সিস্‌মোগ্রাফ (seismograph) বা ভূকম্পন-লেখকযন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে নানারূপ পরীক্ষা করে পেট্রোলিয়মের অনুসন্ধান করেন। যেখানে পেট্রোলিয়ম সঞ্চিত থাকে তার উপরের কুব্জভাঁজ অথবা মাটির আগ্নেয়গিরির উপরিস্থ টুপির মত ছাদটার সন্ধানও এঁদের পরীক্ষায় পাওয়া যায়। আর সেইটাই তৈলকূপ বসাবার পক্ষে আদর্শ জায়গা বলে স্থির করা হয়।

৭. পেট্রোলিয়ম উত্তোলন

ভূগর্ভের যেখানে পেট্রোলিয়ম সঞ্চিত থাকে তাকে বলা হয় পেট্রোলিয়মের খনি, আর তার উপরিভাগকে বলা হয় তৈলক্ষেত্র। বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিত হলে পর তৈলকূপ বসাবার পরিকল্পনা করা হয়। সাধারণত শিলাস্তরের কুব্জভাঁজের নীচে তেল সঞ্চিত থাকে; এইজন্য টুপির মত ছাদটির অবস্থান সম্বন্ধে অতি নির্ভুল হিসেব করা দরকার। হিসেবে অতি সামান্য ভুল হলেও ভূগর্ভের ২০।২৫ হাজার ফুট নীচ পর্যন্ত যেতে এই ভুলের মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যায়, তার ফলে শেষ পর্যন্ত তৈলবাহী স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয় না।

তেলের জন্য নলকূপ বসাবার কাজ পানীয় জলের নলকূপ বসাবার মত সহজসাধ্য নয়। সাধারণত ২৫০।৩০০ ফুট নীচেই উৎকৃষ্ট পানীয় জল পাওয়া যায়, কিন্তু তেলের জন্য প্রায়ই ২,৫০০।৩,০০০ থেকে শুরু করে ২৫,০০০।

৩০,০০০ হাজার ফুট গভীর নলকূপ বসাবার প্রয়োজন হয়। নলকূপ যত গভীর হয় তা বসাবার খরচও তত বেড়ে যেতে থাকে। শুধু একটা তৈলকূপ বসাবার খরচই ২৫।৩০ লক্ষ টাকা হয়ে পড়ে।

প্রচুর অর্থব্যয় করে নানারূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিত প্রমাণ পেলে তার পর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নলকূপ বসানো হয়। কিন্তু এত হিসেব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে পেট্রোলিয়ম পাওয়া যাবে তার কোনো স্থিরতা থাকে না। নানারূপ প্রাকৃতিক কারণে পেট্রোলিয়মের স্থান পরিবর্তন হয় বলেই এরূপ ঘটে থাকে। ১৯৪৮ সালে আমেরিকার উইয়োমিং অঞ্চলে ১৭,৮৩২ ফুট গভীর নলকূপ বসিয়েও তেল পাওয়া যায় নি। এর পরের বছরই ক্যালিফোর্নিয়াতে ১৮,৭৩৪ ফুট গভীর নলকূপ বসিয়েও তেল আহরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকার নলকূপখননকারীরা এইরূপ নিষ্ফল প্রচেষ্টার নাম দিয়েছেন ওআইল্ড ক্যাটিং (wild-catting), এ যেন আন্দাজের উপর বন-বিড়ালের পিছনে নিষ্ফল ছুটোছুটি করার শামিল। দেখা গেছে, প্রতি দশটি নলকূপের মধ্যে নয়টিই 'বন-বিড়াল' পর্যায়ে পড়ে। তবে এরূপ নয়টি নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর যদি একটিমাত্র প্রচেষ্টাও সফল হয় তা হলে কোম্পানির সকল লোকসান অল্পদিনেই পুষিয়ে যায় এবং তার পর থেকে কোম্পানি মুনাফার হিসেব কষতে থাকে। আর্থিক দিক দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে এ অনেকটা জুয়াখেলার মত, লাভ-লোকসান সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অনুসন্ধান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত একটি খনিকে তৈলপ্রসূ করতে হলে কোটি কোটি টাকার মূলধন নিয়োগ করতে হয়; তা ছাড়া সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকায় এই মূলধন অপব্যয় করার মত আর্থিক সামর্থ্য ও মনোবল দুইই প্রয়োজন হয়।

তৈলক্ষেত্রের উপর লোহা অথবা কাঠ দিয়ে প্রায় ১৫০ ফুট উঁচু একটি ডেরিক (derrick) বা কাঠামো তৈরি ক'রে সেখানে ড্রিলিং (drilling) পদ্ধতিতে নল বসানো হয়। তৈলবাহী স্তরে পৌঁছবার আগে অনেক

জলবাহী স্তর পার হয়ে যেতে হয়। নলের ফাঁক দিয়ে জল চুঁইয়ে নীচের দিকে নেমে গেলে খুব লোকসান হয়, কারণ জলের উপর তেল ভেসে উঠে অন্যত্র সরে যায়। এরূপ জলবাহী স্তর থাকলে আসল নলের চেয়ে অধিক ব্যাসের দুটো অতিরিক্ত নল বসিয়ে তার মাঝে সিমেণ্ট ঢেলে ফাঁকটা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে এক ফোঁটা জলও নীচের দিকে নেমে যেতে না পারে। কাজের সুবিধার জন্য নলকূপ যত গভীর হতে থাকে নলের ব্যাস তত কমিয়ে দেওয়া হয়। একটি নলকূপের উপরিভাগে ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের নল দিয়ে কাজ শুরু করলে হয়তো সব নীচে মাত্র ৪ ইঞ্চি ব্যাসের নল দিয়ে শেষ করা হয়।

ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ম এবং গ্যাস অত্যধিক চাপে থাকলে নল বসাবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রবলবেগে গ্যাস ও তেল উপরে উঠে আসতে থাকে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিক গ্যাস যথাসম্ভব সংগৃহীত হয় অথবা তা জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয়, আর বড় বড় লোহার পাত্রে তেল সঞ্চয় করে রাখা হয়। গ্যাসের চাপ ক্রমশ কমে গেলে পেট্রোলিয়ম আর আপনা থেকে উপরে উঠতে পারে না, তখন পাম্পের সাহায্যে তেল উপরে তোলবার ব্যবস্থা করা হয়।

আগেকার দিনে চৌবাচ্চার মত খোলা পাত্রে তেল জমা করে রাখা হত। এতে পেট্রোলিয়মের উদ্বায়ী অংশের যথেষ্ট অপচয় হত আর অনেক সময় আগুন লেগে যেত। আজকাল লোহার আবদ্ধ ট্যাঙ্ক (tank) বা তৈলাধারে তেল সঞ্চয় করে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। পাত্রে সামান্য ছিদ্র থাকলে প্রচুর তেল চুইয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেজন্য যাতে পাত্রে কোনো ছিদ্র না থাকে সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়।

সমুদ্রপথে স্থান থেকে স্থানান্তরে সহজদাহ্য তরল পেট্রোল জাতীয় দ্রব্যাদি চালান করার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত তৈলবাহী জাহাজ ব্যবহার করা হয়। স্থলপথেও তেল চালান করার জন্য তৈলবাহী মালগাড়ি এবং তৈলবাহী মোটরগাড়ি প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। দূর বিদেশে তেল চালান করতে হলে

সমুদ্রপথই প্রশস্ত এবং তৈলক্ষেত্র থেকে সমুদ্রপথ পর্যন্ত তেল বহন করার কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা এবং রাশিয়ায় সুদীর্ঘ নলপথ বা পাইপ-লাইন বসানো হয়েছে। এইসব নলের ভিতর দিয়ে পাম্পের সাহায্যে বিনা অপচয়ে এবং অল্পায়াসে সমুদ্রতীর পর্যন্ত এবং সোজাসুজি একেবারে তৈলবাহী জাহাজে পেট্রোলিয়ম অথবা পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদি পৌঁছে দেওয়া হয়।

অনেক সময় কর্মীদের অসাবধানতায় তৈলক্ষেত্রে আগুন লেগে প্রচুর তেল নষ্ট হয়ে যায়। দৈবাৎ এরূপ আগুন লাগলে যাতে তা সহজেই নিবিয়ে ফেলা যায় সেজন্য সর্বদাই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দিয়ে এইরূপ আগুন নেবানো যায়। ঘণ্টার গঠনের মত বিরাট আচ্ছাদন নলকূপের মুখে চাপা দিয়েও অনেক সময় এইরূপ আগুন নেবান যায়। আজকাল আবার একটা নূতন উপায়ে আগুন নেবাবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। একটা লম্বা তারের মাথায় করে খানিকটা ডিনামাইট একেবারে তৈলকূপের সুবিশাল জ্বলন্ত শিখার খুব কাছাকাছি নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তার ফলে সজোরে বায়ু বহাতে অগ্নিশিখা একমুহূর্তে নিবে যায়—এ যেন বড় ফুঁ দিয়ে বাড়ন্ত প্রদীপ-শিখা নেবানো হল!

৮. শোধন ও পৃথকীকরণ

ভূগর্ভ থেকে গাঢ় ব্রাউন রঙের কাদামাটি-গোলা পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়। এই তেল কাদামাটি থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে বড় বড় পাত্রে জল মিশ্রিত করে গরম করা হয়, তাতে কাদামাটি থিতিয়ে পড়ে আর জলের উপর পেট্রোলিয়ম ভেসে ওঠে। একে অন্য একটি পাত্রে ঢেলে নিয়ে চোলাই করে (distillation) শোধন করা হয়। বাজারের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্ক মাত্রায় (boiling point) তেলের বিভিন্ন উদ্বায়ী অংশগুলি সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন

অংশ জ্বালানি তেল রূপে ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়ম থেকে যেসকল প্রয়োজনীয় অংশ পৃথক করা হয় তার তালিকা নীচে দেওয়া গেল—

তালিকা ৩। পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদি

স্ফুটনাঙ্ক (boiling point)	তেলের চলতি নাম	ব্যবহার
০°-৭০° সেন্টিগ্রেড	পেট্রোলিয়ম ইথর (petroleum ether)	জ্বালানি তেল, দ্রাবক
০°-১২০° সেন্টিগ্রেড	পেট্রোল (petrol)	মোটর বা বিমানের জ্বালানি তেল
২০°-১৫০° সেন্টিগ্রেড	বেনজাইন (benzine)	গরম কাপড় ধোলাই করার জন্য
৫০°-২০০° সেন্টিগ্রেড	কেরোসিন (kerosene)	জ্বালানি তেল
০০°-৩৫০° সেন্টিগ্রেড	ডিজেল তেল (diesel oil)	ডিজেল এঞ্জিনের জ্বালানি তেল
৫০° ও তদূর্ধ্ব সেন্টিগ্রেড	ল্যুব্রিকেটিং বা পিচ্ছিলকারী তেল	যন্ত্রাদির পিচ্ছিলকারী তেল
	তরল প্যারাফিন (liquid paraffin)	জোলাপের ওষুধ
গলনাঙ্ক (melting point)	ভ্যাসেলিন (vaseline)	প্রসাধন দ্রব্যাদি তৈরির জন্য
৪৮°-৬২° সেন্টিগ্রেড	কঠিন প্যারাফিন বা মোম (paraffin wax)	মোমবাতি তৈরির জন্য
অনুদ্বায়ী অংশ	অ্যাস্‌ফাল্ট (asphalt)	রাস্তা তৈরির জন্য

জ্বালানি তেলের চাহিদা বেশি হলে অপরিচ্ছন্ন পেট্রোলিয়ম লোহার বক-যন্ত্রে (retort) নিয়ে আগুনের সাহায্যে গরম করা হয় এবং আংশিক পাতন-প্রক্রিয়ায় (fractional distillation) বিভিন্ন অংশ পৃথক করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত উদ্বায়ী জ্বালানি তেলের পরিমাণ বেশি হয়। কিন্তু পিচ্ছিলকারী তেল কিংবা ভ্যাসেলিন ইত্যাদি বেশি পরিমাণে পেতে হলে পাতন-যন্ত্রে সোজাসুজি আগুন দিয়ে উত্তাপ দেওয়া চলে না। বাষ্পের সাহায্যে তেলে উত্তাপ দিয়ে পাতন-ক্রিয়া সম্পাদন করলে উৎকৃষ্ট পিচ্ছিলকারী তেল ইত্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু এভাবে জ্বালানি তেলের পরিমাণ অনেক কমে যায়।

পেট্রোল ॥ মোটরগাড়ি, বিমান প্রভৃতির জন্য পেট্রোলের চাহিদা খুব বেশি। অপরিচ্ছন্ন পেট্রোলিয়মের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ পেট্রোল রূপে পাওয়া যায়। পেট্রোলকে দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে বেশ জোরে ঝাঁকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। ক্রমে অ্যাসিড থিতিয়ে পড়ে। নীচ থেকে ময়লা অ্যাসিড ও গাদ বের করে নিয়ে পরপর কয়েকবার জল দিয়ে তেল থেকে অ্যাসিড ধুয়ে বের করে দেওয়া হয়। এভাবে দুর্গন্ধমুক্ত এবং অ্যাসিডমুক্ত করার পর পেট্রোল মোটরগাড়ি ও বিমানে ব্যবহারের জন্য বাজারে চালান দেওয়া হয়।

কেরোসিন ॥ অপরিচ্ছন্ন তেলের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কেরোসিন রূপে পাওয়া যায়। আলোক উৎপাদনের জন্য সাধারণত কেরোসিন তেল ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলের মত এই তেলকেও সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে দুর্গন্ধমুক্ত করা হয়। এই তেল লণ্ঠনের খুব পাতলা ধাতব তৈলাধারে থাকে বলে এতে সামান্য অ্যাসিড থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ তাহলে খুব সহজেই তৈলাধার ক্ষয় হয়ে ফুটো হয়ে যায়। সেইজন্য অ্যাসিড দিয়ে দুর্গন্ধমুক্ত করার পর বারবার জল দিয়ে ধুয়ে তেলকে যথাসম্ভব অ্যাসিডমুক্ত করা হয়। তার পর সামান্য ক্ষার (alkali) দিয়ে অ্যাসিড সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে আবার কয়েকবার জল দিয়ে ধুয়ে তেলকে ক্ষারমুক্ত করলে তবে তা ব্যবহারের উপযোগী হয়।

পেন্‌সিলভানিয়ার তেলে গন্ধকের পরিমাণ খুব কম বলে এই তেল ব্যবহারে কোনো অসুবিধা হয় না। অপরদিকে ওহাইও, টেক্সাস, কানাডা প্রভৃতি অঞ্চলের তেলে গন্ধকের পরিমাণ বেশি থাকায় সেগুলি ব্যবহার করলে লণ্ঠনের সল্‌তে তাড়াতাড়ি পুড়ে যায় এবং লণ্ঠনে অত্যন্ত ধোঁয়া হয়। এভাবে খানিকক্ষণ পরেই লণ্ঠনের চিমনিতে প্রচুর কালি জমে যায় বলে ভালো আলো পাওয়া যায় না। এইসব অঞ্চলের তেল সম্পূর্ণরূপে গন্ধকমুক্ত করলে তবে ব্যবহারের উপযোগী হয়। লেড অক্সাইড (lead oxide) বা কপার অক্সাইড (copper oxide)

সহযোগে এইরূপ তেল ঝাঁকালে অবাঞ্ছিত গন্ধক লেড বা কপার সাল্‌ফাইড রূপে থিতিয়ে পড়ে যায়। এইবার তেল ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করলে লণ্ঠনের সল্‌তে তেমন বেশি পোড়ে না বলে উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়।

ডিজেল তেল॥ যে তেল পেট্রোল ও কেরোসিনের চেয়ে ভারি অথচ পিচ্ছিলকারী তেলের চেয়ে হাল্কা (স্ফুটনাঙ্ক ২০০ থেকে ৩৫০° সেন্টিগ্রেড) তা সাধারণত ডিজেল এঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়। এই তেলের কিছু পিচ্ছিলকারী গুণ থাকা প্রয়োজন, নতুবা যে পিচকারির ভিতর দিয়ে এঞ্জিনে তেল প্রবেশ করানো হয় তা বন্ধ হয়। তাছাড়া এই তেলের তলানি পড়লেও চলে না। পিচকারির মুখ বন্ধ হয়ে যায় বলে।

ল্যুব্রিকেটিং বা পিচ্ছিলকারী তেল॥ পেট্রোলিয়মের আংশিক পাতন-প্রক্রিয়ার ফলে সবশেষে যে ভারি তেল পাওয়া যায় (শতকরা ১০।১২ ভাগ) তা থেকেই পিচ্ছিলকারী তেল এবং কঠিন প্যারাফিন উৎপাদন করা হয়। অত্যন্ত ঘন বলে উত্তাপের সাহায্যে পাতলা করে নিয়ে তার পর সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে একে দুর্গন্ধমুক্ত করা হয়। এবারে —৬° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় (0° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বরফ গলে) ঠাণ্ডা করে তার পর 'ফিল্টার প্রেস' (filter press) যন্ত্র সাহায্যে কঠিন প্যারাফিন পিচ্ছিলকারী তেল থেকে ছেঁকে আলাদা করা হয়। এভাবে যে পিচ্ছিলকারী তেল পাওয়া যায় তাকেই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। পিচ্ছিলকারী তেলকে আবার চোলাই করলে তা থেকে পাওয়া যায় তরল প্যারাফিন যা জোলাপের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কঠিন প্যারাফিন বা মোম॥ যন্ত্র সাহায্যে ছেঁকে নিলেও কঠিন প্যারাফিনের সঙ্গে অনেক তরল প্যারাফিন থেকে যায় বলে এই প্যারাফিন খুব নরম থাকে এবং তা দিয়ে মোমবাতি তৈরি করা যায় না। প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় (sweating process) তরল প্যারাফিন পৃথক করলে তবে তা মোমবাতি তৈরির উপযোগী হয়।

একটি ঘরের মধ্যে উপর থেকে নীচে পর পর অনেকগুলি অগভীর পাত্র সাজানো থাকে। এইসব পাত্রে প্যারাফিন গালিয়ে নিয়ে তার পর ঠাণ্ডা করলে প্যারাফিন জমাট বেঁধে যায়। এবারে সাবধানে সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করা হয় যাতে তরল প্যারাফিন ঘামের মত ঝরে পড়তে থাকে। এভাবে তরল প্যারাফিন সম্পূর্ণ রূপে ঝরে পড়ে গেলে উৎকৃষ্ট কঠিন প্যারাফিন পাওয়া যায়। এবারে আরও বেশি উত্তাপ দিলে ব্রাউন রঙের কঠিন প্যারাফিন গলে বেরিয়ে আসে। এর মধ্যে অঙ্গার-চূর্ণ (charcoal) দিলে তা রংটা শুষে নেয়। এর পর উত্তপ্ত অবস্থায় ছেঁকে নিলে যে সাদা মোম পাওয়া যায় তাকে ছাঁচে ঢালাই করে মোমবাতি তৈরি করা হয়।

অ্যাস্‌ফাল্ট ॥ আংশিক পাতন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে পেট্রোলিয়মের উদ্বায়ী অংশগুলি পৃথক করে নেবার পর পাতন-যন্ত্রে যে চট্‌চটে কালো পদার্থ অবশেষ রূপে পড়ে থাকে তার নাম অ্যাস্‌ফাল্ট। এরই সাহায্যে সভ্যজগতের রাজপথ তৈরি করা হয়।

৯. পেট্রোলিয়মের উপাদান

পেট্রোলিয়মের প্রধান উপাদানগুলি সবই কার্বন (carbon) ও হাইড্রোজেন (hydrogen) সমাবেশে গঠিত হাইড্রোকার্বন (hydro-carbon) জাতীয়। বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত পেট্রোলিয়মের নমুনাতে তিন প্রকার হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়, যেমন—

(ক) অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন (aliphatic hydrocardon),

(খ) অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন (alicyclic hydrocarbon), ও

(গ) অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন (aromatic hydrocarbon)।

প্রত্যেক রকম হাইড্রোকার্বন অণুর গঠনেই আবার নানারকম বৈচিত্র্য দেখা

যায়, তবে তাদের সবের মধ্যেই কার্বন পরমাণুর যোজ্যতা (valency) চার থাকে।

পেট্রোলিয়ম উপরোক্ত তিন জাতের বিবিধ হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ, তাই এর উপাদানগুলি বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করে তাদের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে যেসব হাইড্রোকার্বনের পরিচয় জানা গেছে তার কিছু বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

(ক) অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন॥ এই জাতীয় হাইড্রোকার্বনের অণুতে কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে একটিমাত্র যোজকের (valency bond) সাহায্যে মিলিত থাকে। এবং বাকি যোজকগুলির সাহায্যে হাইড্রোজেন-পরমাণু যুক্ত থাকে। একে পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন (saturated hydrocarbon) বলা হয়, চলতি কথায় তার নাম প্যারাফিন (paraffin)। এই জাতীয় অণুর সাধারণ সঙ্কেত (formula) C_nH_{2n+2}। মিথেন (methane) ইথেন (ethane) বিউটেন (butane) ইত্যাদি এই জাতীয়।

```
                                                          H
                                                          |
সংযুক্তি     H           H   H         H   H   H       H  H-C-H  H       H   H   H   H
সঙ্কেত   H-C-H       H-C---C-H     H-C---C---C-H     H-C --- C --- C-H   H-C---C---C---C-H
             H           H   H         H   H   H       H     H     H       H   H   H   H
```

সংক্ষেপে	CH_4	CH_3-CH_3	$CH_3-CH_2-CH_3$	$CH_3-CH(CH_3)-CH_3$	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$
	মিথেন	ইথেন	প্রপেন	২-মিথাইল প্রপেন (আইসো-বিউটেন)	বিউটেন
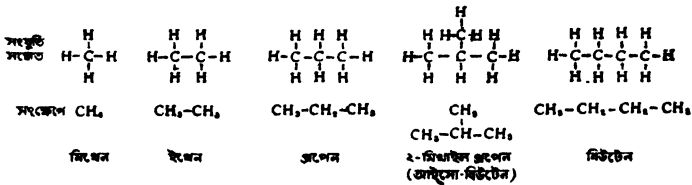
এইরকম হাইড্রোকার্বনের অণুতে কোনো দুটি বা আরও বেশি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে দুইটি যোজকের বা দ্বিবন্ধের (double bond) সাহায্যে মিলিত থাকলে তাকে অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন (unsaturated hydrocarbon) বা ওলিফাইন (olefine) বলা হয়। এই জাতীয় অণুর সাধারণ সঙ্কেত C_nH_{2n}, C_nH_{2n-2} ইত্যাদি। ইথিন (ethene), বিউটিন

(butene) প্রভৃতি এই জাতীয়। অপরিপৃক্ত যৌগগুলিকে হাইড্রোজেনান্বিত করলে (hydrogenation) তারা পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বনে পরিণত হয়।

সংযুক্তি সঙ্কেত	H–C=C–H (H, H)	H–C–C–C=C–H	H–C–C=C–C–H	H–C – C=C–H (H–C–H)
সংক্ষেপে	$CH_2=CH_2$	$CH_3-CH_2-CH=CH_2$	$CH_3-CH=CH-CH_3$	$CH_3-C(CH_3)=CH_2$
	এথিন	বিউটিন—১	বিউটিন—২	২-মিথাইল প্রপিন (আইসো-বিউটিন)
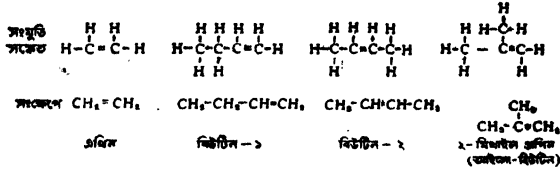
(খ) অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন ॥ এগুলি সাধারণভাবে সাইক্লো-পেণ্টেন (cyclo-pentane, C_5H_{10}), সাইক্লো-হেক্সেন (cyclo-hexane, C_6H_{12}) ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত বলা যায়। এদের অণুতে পাঁচটা ছয়টা অথবা তার চেয়ে বেশি বা কম সংখ্যক কার্বন পরমাণু রিংএর আকারে সাজানো থাকে, তা ছাড়া কার্বন পরমাণুগুলি সবই পরস্পরের সঙ্গে একটিমাত্র যোজকের সাহায্যে মিলিত থাকে। এদের ধর্ম অনেকটা পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মত। চলতি কথায় এদের ন্যাপ্থিন (naphthene) বলা হয়।

সাইক্লো-পেণ্টেন: H_2C, CH_2, H_2C, CH_2, CH_2

মিথাইল সাইক্লো-পেণ্টেন: H_2C, $CH-CH_3$, H_2C, CH_2, CH_2

১:১ ডাই মিথাইল সাইক্লো-পেণ্টেন: H_2C, $C(CH_3)-CH_3$, H_2C, CH_2, CH_2

সাইক্লো-হেক্সেন: CH_2, H_2C, CH_2, H_2C, CH_2, CH_2

মিথাইল সাইক্লো-হেক্সেন: CH_2, H_2C, $CH-CH_3$, H_2C, CH_2, CH_2

ইথাইল সাইক্লো-হেক্সেন: CH_2, H_2C, $CH-CH_2-CH_3$, H_2C, CH_2, CH_2
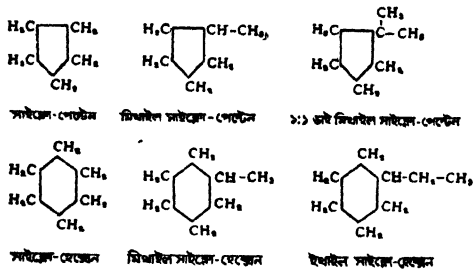
(গ) অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন ॥ এই জাতীয় হাইড্রোকার্বন সাধারণভাবে বেন্‌জিন (benzene, C_6H_6), ন্যাপ্‌থ্যালিন (naphthalene,

$C_{10}H_8$) ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত বলা যায়। বেন্‌জিন অণুতে ছয়টি কার্বন পরমাণু রিংএর আকারে সাজানো থাকে, কিন্তু এই রিংএর মধ্যে তিনটি দ্বিবন্ধ আছে বলে বেন্‌জিন অপরিপৃক্ত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাইড্রোজেনায়িত করে একে সাইক্লো-হেক্সেনে রূপান্তরিত করা যায়, কারণ উভয়ের কাঠামো একই রকম। টলুইন (toluene), কিউমিন (cumene) ইত্যাদিও এই জাতীয়। ন্যাপ্‌থ্যালিন-অণুতে ১০টি কার্বন পরমাণু মিলে এমনভাবে দুটো রিং সৃষ্টি করেছে যে মনে হয় দুটো বেন্‌জিন রিং পরস্পর জুড়ে রয়েছে।
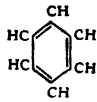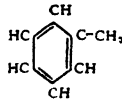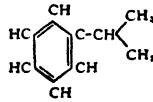
বেন্‌জিন — মিথাইল বেন্‌জিন — আইসো-প্রপাইল বেন্‌জিন
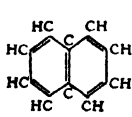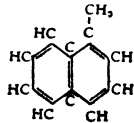
ন্যাপ্‌থ্যালিন — ১-মিথাইল ন্যাপ্‌থ্যালিন — ২-মিথাইল ন্যাপ্‌থ্যালিন
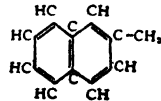
আমেরিকার পেট্রোলিয়মের উদ্বায়ী অংশ থেকে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য হাইড্রোকার্বনগুলির বিবরণ দেওয়া হল—

তালিকা ৪। আমেরিকার পেট্রোলিয়মের উদ্বায়ী অংশ থেকে প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বনের পরিচয়

হাইড্রোকার্বনের নাম	অণুর সংকেত	স্ফুটনাঙ্ক (° সেঃ)	অক্টেন-মান
প্যারাফিন—			
মিথেন	CH_4	—১৬১·৭	১০০
ইথেন	C_2H_6	—৮৮·৬	১০০
প্রপেন	C_3H_8	—৪২·২	১০০
২ মিথাইল প্রপেন (আইসো-বিউটেন)	C_4H_{10}	—১১·৮	৯৭
বিউটেন	,,	—০·৫	৯০·৫
২-মিথাইল বিউটেন (আইসো-পেন্টেন)	C_5H_{12}	২৭·৯	৯১
পেন্টেন	,,	৩৬·১	৬১
২ : ২-ডাইমিথাইল বিউটেন	C_6H_{14}	৪৯·৭৪	৯৪
২ : ৩- ,, ,,	,,	৫৮·০	৯৩
২-মিথাইল পেন্টেন	,,	৬০·৩	৭৩
৩- ,, ,,	,,	৬৩·৩	৭৫
হেক্সেন	,,	৬৮·৭	২৫
২ : ২- ডাইমিথাইল পেন্টেন	C_7H_{16}	৭৮·৯	৯৩
২ : ৪- ,, ,,	,,	৮০·৫	৮২
২ : ৩- ,, ,,	,,	৮৯·৮	৮৯
২-মিথাইল হেক্সেন	,,	৯০·০	৪৫
৩- ,, ,,	,,	৯২·০	...
হেপ্টেন	,,	৯৮·০	০
২-মিথাইল হেপ্টেন	C_8H_{18}	১১৭·৬	
অক্টেন	,,	১২৫·৬	—২০
২ : ৬-ডাইমিথাইল হেপ্টেন	C_9H_{20}	১৩৫·২	
২-মিথাইল অক্টেন	,,	১৪৩·৩	
৩- ,, ,,	,,	১৪৪·২	
ননেন	,,	১৫০·৭	—৩৪
২-মিথাইল ননেন	$C_{10}H_{22}$	১৬৬·৮	
৩- ,, ,,	,,	১৬৭·৮	
ডিকেন	,,	১৭৪·০	
ইত্যাদি			

হাইড্রোকার্বনের নাম	অণুর সংকেত	স্ফুটনাঙ্ক (° সেঃ)	অক্টেন-মান
ন্যাপ্‌থিন—			
সাইক্লো-পেণ্টেন	C_5H_{10}	৪৯·৫	৮৫
মিথাইল সাইক্লো-পেণ্টেন	$C_5H_9—CH_3$	৭১·৯	৮০
১ : ১-ডাইমিথাইল সাইক্লো-পেণ্টেন	$C_5H_8 : (CH_3)_2$	৮৭·৫	
সাইক্লো-হেক্সেন	C_6H_{12}	৮০·৮	৭৭
মিথাইল সাইক্লো-হেক্সেন	$C_6H_{11}—CH_3$	১০০·৯	৭১
১ : ১-ডাইমিথাইল সাইক্লো-হেক্সেন	$C_6H_{10} : (CH_3)_2$	১১৯·৮	
ইথাইল সাইক্লো-হেক্সেন	$C_6H_{11}—C_2H_5$	১৩১·৮	৪১
১:২:৪-ট্রাইমিথাইল সাইক্লো-হেক্সেন ইত্যাদি	$C_6H_9 : (CH_3)_3$	১৪১·২	
অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন—			
বেন্‌জিন	C_6H_6	৮০·১	১০০
মিথাইল বেন্‌জিন (টলুইন)	$C_6H_5—CH_3$	১১০·৬	১০০
ইথাইল বেন্‌জিন	$C_6H_5—C_2H_5$	১৩৬·২	৯৭
১ : ৪-ডাইমিথাইল বেন্‌জিন	$C_6H_4 : (CH_3)_2$	১৩৮·৪	
১ : ৩- ”	”	১৩৯·২	
১ : ২- ”	”	১৪৪·৪	
আইসো-প্রপাইল বেন্‌জিন (কিউমিন)	$C_6H_5—C_3H_7$	১৫২·৪	১০০
প্রপাইল বেন্‌জিন	”	১৫৯·৫	৯৬
১ : ২ : ৪-ট্রাইমিথাইল বেন্‌জিন	$C_6H_3 : (CH_3)_3$	১৬৯·২	
১ : ২ : ৩- ” ইত্যাদি	”	১৭৬·১	

১০. বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়ম

পূর্বেই বলা হয়েছে, যে-কোনো দেশের পেট্রোলিয়মেই মোটামুটিভাবে তিন-জাতের হাইড্রোকার্বনই পাওয়া যায়, কিন্তু তেলখনির ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে তেলের উপাদানগুলির পরিমাণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পেট্রোলিয়ম

সৃষ্টির আদিতে বিভিন্ন দেশের তৈলবাহী স্তরের ভৌগোলিক অবস্থান আর তাতে পুঞ্জীভূত জৈব পদার্থের যথেষ্ট পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সেইজন্য খনিজ তেলে এরূপ পার্থক্য দেখা যায়।

সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের তেল হালকা তাতে প্যারাফিনের মাত্রা বেশি। কোনো কোনো জায়গার তেল থেকে বেন্‌জাইন এবং অ্যাসফাল্ট যথেষ্ট পাওয়া যায়। লুইসিয়ানার তেলে পিচ্ছিলকারী তেলের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্যালিফোর্নিয়ার তেলে পেট্রোলের ভাগ খুব বেশি দেখা যায় (শতকরা ২৬·৯—৭৩·৯ ভাগ) তবে এই অঞ্চলের তেলে নাইট্রোজেন (শতকরা ২ ভাগ) এবং গন্ধক (শতকরা ০·১৪—১·১৩ ভাগ) বেশি থাকায় তেল শোধন করা কষ্টসাধ্য হয়। পেন্‌সিল্‌-ভানিয়া অঞ্চলের তেলে প্যারাফিন বেশি থাকে। নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের পরিমাণ কম থাকায় (শতকরা ০·০০৮ ভাগ) শোধন করা খুব সহজ।

মেক্সিকো অঞ্চলের তেল দুরকম। হালকা তেল থেকে পেট্রোল বেন্‌জাইন ও কেরোসিন যথেষ্ট পাওয়া যায়, আর ভারি তেল থেকে উৎকৃষ্ট অ্যাস্‌ফাল্ট আর বেশি পরিমাণ কেরোসিন, ডিজেল তেল ও পিচ্ছিলকারী তেল পাওয়া যায়। এতে বেন্‌জাইনের পরিমাণ খুব কম থাকে, গন্ধক ঘটিত পদার্থের পরিমাণ বেশি (১·৮১—৩·৬৭ ভাগ)।

কানাডায় খনিজ তেলের উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। এদেশের তেলে প্যারাফিন ও ওলিফাইন প্রচুর থাকে। এতে পিচ্ছিলকারী তেলের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গন্ধকের পরিমাণ খুব বেশি নয়।

পেট্রোলিয়ম উত্তোলনের পরিমাণ হিসেবে রাশিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। বালাখানি ও বিবি-আইবাত খনির তেলে কঠিন প্যারাফিনের একান্ত অভাব দেখা যায়। এই তেলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই ন্যাপ্‌থিন, তা ছাড়া এতে অ্যাসিড জাতীয় পদার্থের পরিমাণও বেশি থাকে। এদেশের

তেলে পেট্রোল ও বেন্‌জাইনের পরিমাণ খুব কম থাকে। এ থেকে উৎকৃষ্ট ডিজেল তেল ও পিচ্ছিলকারী তেল পাওয়া যায়।

রুমানিয়ার তেলে সব জাতীয় হাইড্রোকার্বনই কম-বেশি মাত্রায় আছে।

ইরান দেশের তেলে প্যারাফিনের ভাগ বেশি এবং ন্যাপ্‌থিনের ভাগ কম; অ্যারোম্যাটিক জাতীয় হাইড্রোকার্বন এবং গন্ধকের পরিমাণ কম থাকে। এদেশের পেট্রোলিয়ম থেকে খুব বেশি পরিমাণ পেট্রোল পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশের তেলে কঠিন প্যারাফিন খুব বেশি পরিমাণে আছে। তারপর আছে ওলিফাইন এবং অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন জাতীয় পদার্থ। নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুবই কম।

আসাম অঞ্চলের তেলে যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রোল, ন্যাপ্‌থ্যালিন এবং প্যারাফিন পাওয়া যায়। গন্ধক নেই।

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাতে বেন্‌জাইন ও কেরোসিনের পরিমাণ বেশি থাকে। বোর্নিয়োর তেলে অ্যারোম্যাটিক হাইড্রো-কার্বন জাতীয় পদার্থের পরিমাণ খুব বেশি (শতকরা ৩৯ ভাগ)।

বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়মে পেট্রোল কেরোসিন ইত্যাদি কি পরিমাণ আছে তার একটা মোটামুটি বিবরণ ৫নং তালিকায় দেওয়া হল। প্রত্যেক দেশেই আবার তৈলক্ষেত্র অনুসারে পেট্রোলিয়মের বিভিন্ন অংশগুলির পরিমাণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়, অবশ্য তাদের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।

তালিকা ৫। বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়ম

দেশ		তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব	গন্ধকের পরিমাণ (শতকরা)	শতকরা ভাগ (আয়তন অনুসারে)				
				পেট্রোল	কেরোসিন	ডিজেল তেল	পিচ্ছিলকারী তেল	অবশিষ্ট
ওকলাহামা		০·৮২৬৫	০·২১	২৫·১	১৪·৯	১১·২	—	৪৮·৬
কানসাস		০·৮৪০৮	০·২৮	২৩·৯	১৬·৭	১৪·৩	—	৪৪·৯
টেক্সাস	(১)	০·৮৫৬০	০·২২	১৪·৮	—	৩০·৯	—	৫৪·৩
	(২)	০·৯২৭৯	২·১২	১৩·১	—	১৯·৩	—	৬৭·৬
ক্যালিফোর্নিয়া	(১)	০·৭৭৮৮	০·১৪	৭৩·৯	—	—	—	২৬·১
	(২)	০·৮৯৬১	১·১৩	২৬·৯	—	৩১·৭	—	৪১·৪
লুইসিয়ানা	(১)	০·৮১৭৯	০·১০	৩৪·২	১৭·২	২৪·৮	১৪·৪	৯·৩
	(২)	০·৯১০০	০·১৪	—	—	৫৫·৫	৩০·৫	১২·৭
মেক্সিকো	(১)	০·৯২৭০	৩·৬৭	১১·৯	১২·০	২০·০	১২·৬	৪০·০
	(২)	০·৮৩৭০	১·৮১	২০·৬	৯·৬	৬·৩	—	৬২·০
কানাডা		০·৮৪৬০	০·৩৩	৩৩·৪	১১·৬	১৪·৫	১৮·৪	২১·৩
ভেনেজুয়েলা	(১)	০·৯৫০০	২·২	৫·৭	—	১৪·৭	—	৭৯·৬
	(২)	০·৮৪০০	০·২	৪০·০	—	২৯·০	—	৩১·০
আর্জেন্টিনা		০·৮৭২০	০·১৯	২৯·৪	—	১৫·৮	২৩·১	৩১·৭
কলম্বিয়া		০·৮১৫৫	০·১৬	৫২·০	২১·০	২২·০	—	৫·০
পেরু		০·৮৩৮৮	০·১০	৩৭·৩	—	—	—	৬১·৮
মিশর		০·৯০০০	২·৮	১২·৫	৭·৫	১৬·০	—	৬৪·০
রাশিয়া		০·৮৭৬২	০·১০	৪·৮	২৭·৫	৭·৩	—	৬০·০
রুমানিয়া		০·৮৪৮০	—	২৬·১	১০·৮	১৬·৮	—	৪৬·৮
ইরান		০·৮৩৬০	১·০	৩৩·৫	২৩·০	—	—	৪৩·৫
ইরাক		০·৮৪৪০	২·০	১৮·৫	১৯·৫	১৭·৫	—	৪৪·৫
বহ্রিন দ্বীপ		০·৮৬৬০	২·০	২৯·৬	১৭·৪	—	—	৫৯·১
ব্রহ্মদেশ		০·৮৪০০	০·১৫	১৮·৪	৩২·৪	৪২·২	—	৬·৪
সুমাত্রা		০·৮০০০	—	৫৫·০	১৫·০	৯·০	—	১৯·৫
বার্নিও		০·৮৫৭০	—	৩৫·০	২৯·০	১৫·৫	—	১৯·০
জাপান		০·৮০৫০	০·২০	৩৬·২	৩০·৭	৭·৫	২৪·৮	—

১১. তেলের অক্টেন-মান ও সিটেন-মান

এঞ্জিনের মধ্যে উদ্বায়ী তেল ও বায়ুর মিশ্রণের বিস্ফোরণ জনিত শক্তির সাহায্যে এঞ্জিন সচল হ'য়ে ওঠে। মোটরের এঞ্জিন এমনভাবে তৈরি যে একটি কোঠায় উদ্বায়ী তেলের গ্যাস এবং বায়ু মিশ্রিত হয় এবং সেইসঙ্গে একটি পিস্টন নেমে এসে গ্যাসের উপর চাপ দেয়। গ্যাস-মিশ্রণ এইভাবে সংকোচনের শেষ সীমায় পৌছবামাত্র ব্যাটারি সাহায্যে একটি স্পার্ক (spark) বা স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, এতে সমস্ত গ্যাসটা জলে ওঠে এবং পিস্টনটিকে উপর দিকে ঠেলে দেয়। পুনরায় ঐ কোঠায় গ্যাস ও বায়ুর মিশ্রণ জমা হয়, পিস্টনটি নেমে আসে এবং পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এঞ্জিনের মধ্যে এইসব ক্রিয়া পর পর ছন্দোবদ্ধভাবে ঘটতে থাকলে পিস্টনটিও ক্রমাগত ছন্দোবদ্ধভাবে উপরে ও নীচে উঠা-নামা করতে থাকে এবং এঞ্জিনটি স্বচ্ছন্দভাবে চলতে থাকে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এমন অনেক উদ্বায়ী তেল আছে যা এঞ্জিনের কোঠায় বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পুরোপুরি সংকুচিত হ'বার আগেই (অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করার আগেই) শুধু এঞ্জিনের উত্তাপেই আপনা থেকে জলে ওঠে। পিস্টনটি নীচের দিকে শেষ সীমায় পৌছবার কিছু আগে এরকম বিস্ফোরণ হয়ে যায় ব'লে পিস্টনে সহসা উপর দিকে ঠেলে তোলবার চাপ পড়ে, এতে তার সহজ গতির ছন্দ নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য অনেক শক্তির অপচয় ঘটে, আর এঞ্জিনের মধ্যে ঝন্‌ঝন্ শব্দ হতে থাকে। একে তেলের নকিং (knocking) ধর্ম বলে। তেলে নকিং ধর্ম বেশি হলে এইরূপ এঞ্জিনে ব্যবহার না করাই ভাল।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, নকিং-বিরোধী ধর্ম সম্পন্ন আদর্শ তেল হল আইসো-অক্টেন, এর অক্টেন-মান (octane-number) ধরা হল ১০০, আর এবিষয়ে নিকৃষ্ট হল হেপ্টেন তাই তার অক্টেন-মান ধরা হল শূন্য। বিজ্ঞানীরা এই দুটো তেলের সঙ্গে তুলনা করে তবে জ্বালানি তেলের নকিং-বিরোধী

ধর্ম নির্ণয় করেন। এক শ ভাগের কতভাগ আইসো-অক্টেনের সঙ্গে কতটা হেপ্টেন মেশালে তার নকিং ধর্ম পরীক্ষিত তেলের অনুরূপ হয় তা নিরূপণ করা হয় এবং সেই সংখ্যার সাহায্যে তেলের অক্টেন-মান নির্দেশ করা হয়।

যে-কোনো হাইড্রোকার্বনের অক্টেন-মান প্রধানতঃ তার স্ফুটনাঙ্ক এবং অণুর গঠনের উপর নির্ভর করে। প্যারাফিন হলে তার স্ফুটনাঙ্ক যত কম হয় অক্টেন-মান তত বেশি দেখা যায়। অণুতে কার্বন পরমাণুগুলি যদি পর পর সরল শৃঙ্খলে (straight chain) সাজানো থাকে তাহলে কার্বন সংখ্যা বাড়ালে হাইড্রোকার্বনের স্ফুটনাঙ্কও সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে এবং সেইসঙ্গে তার অক্টেন-মানও কমে যায় (তালিকা ৬ দ্রষ্টব্য)। অপর দিকে কার্বন সংখ্যা সমান রেখে অণুতে কার্বন পরমাণুগুলি সরল শৃঙ্খলে না সাজিয়ে যদি শাখা-প্রশাখায় (branched chain) সাজানো যায় তবে স্ফুটনাঙ্ক কমে আর অক্টেন-মান বাড়ে। শাখা-প্রশাখার সংখ্যা যত বেশি হয় স্ফুটনাঙ্ক তত কম এবং অক্টেন-মান তত বেশি হয় (তালিকা ৪ দ্রষ্টব্য)। এইসব হাইড্রোকার্বনের চল্‌তি নাম আইসো-প্যারাফিন (iso-paraffin)।

$$CH_3-C(CH_3)_2-CH_2-CH_3$$

স্ফুঃ - ৪৯·৭৪° সেঃ
অঃ মাঃ - ৯৪

$$CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3$$

৫৮° সেঃ
৯৩

$$CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3$$

স্ফুঃ - ৬০·৩° সেঃ
অঃ মাঃ - ৭৩

$$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$$

৬৮·৭° সেঃ
২৫
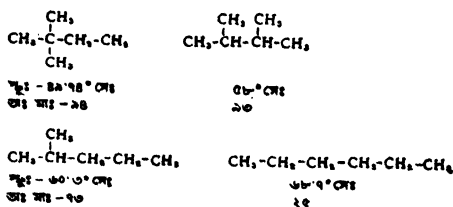
কার্বন পরমাণু সরল শৃঙ্খলে সাজানো থাকলে দেখা যায় যে অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের স্ফুটনাঙ্ক অনুরূপ পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে কম। অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের অক্টেন-মান পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের অক্টেন-মানের চেয়ে বেশি (তালিকা ৬ দ্রষ্টব্য)।

তালিকা ৬। কয়েকটি পরিপৃক্ত ও অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের অক্টেন-মানের তুলনা

হাইড্রোকার্বনের নাম	অণুর সঙ্কেত	স্ফুটনাঙ্ক	অক্টেন-মান
১। পেণ্টেন	C_5H_{12}	৩৬°১	৬১
পেণ্টিন-১	C_5H_{10}	৩০°১	৮২
২। হেক্সেন	C_6H_{14}	৬৮.৭	২৫
হেক্সিন-১	C_6H_{12}	৬৩°৫	৬২
৩। হেপ্টেন	C_7H_{16}	৯৮°৪	০
হেপ্টিন-১	C_7H_{14}	৯৩°১	৪৫
৪। অক্টেন	C_8H_{18}	১২৫°৬	−২০
অক্টিন-১	C_8H_{16}	১২২°৫	৩৫

ন্যাপ্‌থিন জাতীয় হাইড্রোকার্বন থেকে আংশিক ভাবে হাইড্রোজেন বিযুক্ত (dehydrogenation) করতে পারলে তা অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে অক্টেন-মান বৃদ্ধি পায় (তালিকা ৭ দ্রষ্টব্য)।

তালিকা ৭.

ন্যাপ্‌থিন			অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন		
নাম	অণুর গঠন	অক্টেন-মান	নাম	অণুর গঠন	অক্টেন-মান
সাইক্লো-হেক্সেন	CH_2 H_2C CH_2 H_2C CH_2 CH_2	৭৭	বেন্‌জিন	CH HC CH HC CH CH	১০০
মিথাইল সাইক্লো-হেক্সেন	CH_2 H_2C $CH-CH_3$ H_2C CH_2 CH_2	৭১	মিথাইল বেন্‌জিন	CH HC $C-CH_3$ HC CH CH	১০০
ইথাইল সাইক্লো-হেক্সেন	CH_2 H_2C $CH-C_2H_5$ H_2C CH_2 CH_2	৪১	ইথাইল বেন্‌জিন	CH HC $C-C_2H_5$ HC CH CH	৯৭

ন্যাপ্থিনের অক্টেন-মান যে আণবিক ভার (molecular weight) এবং অণুর শাখা-প্রশাখার উপর অনেকখানি নির্ভর করে তা তালিকা ৪ ও ৭ থেকেই বোঝা যায়। ইথাইল সাইক্লো-হেক্সেনের চেয়ে মিথাইল সাইক্লো-হেক্সেনের, আবার তার চেয়ে সাইক্লো-হেক্সেনের অক্টেন-মান বেশি। সাইক্লো-পেন্টেনের চেয়ে সাইক্লো-হেক্সেন ভারি ও তার স্ফুটনাঙ্ক বেশি আর তার অক্টেন-মান কম। অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের বেলায়ও অণুর গঠন ও তার শাখা-প্রশাখার উপর অক্টেন-মান নির্ভর করে।

উচ্চতর অক্টেন-মান বিশিষ্ট তেলের সার্থকতা॥ আদর্শ এঞ্জিন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যে তেলের অক্টেন-মান যত বেশি তার নকিং ধর্ম তত কম। তেলের অক্টেন-মান বেশি হলে অল্প পরিমাণ তেল পুড়িয়ে বেশি মাইল পথ অতিক্রম করা যায় (তালিকা ৮ দ্রষ্টব্য)।

তালিকা ৮

এঞ্জিনের সঙ্কোচন মাত্রা (Compression ratio)	এক গ্যালন তেল পুড়িয়ে অতিক্রম করা যায়
৫·২৫	১২·৫ মাইল
৮·১	১৮·০ মাইল
১০·৩	২১·০ মাইল

আজকাল বিমানের জন্য উচ্চতর অক্টেন-মান বিশিষ্ট তেলের চাহিদা খুব বেশি। বিমানে একসঙ্গে অনেকটা তেল বহন করা সম্ভব হয় না, অথচ অধিক দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে বার বার মাটিতে নেমে এসে পেট্রোল বোঝাই করার অসুবিধা। ইংলণ্ড থেকে সুদূর আমেরিকা পাড়ি দেবার সময় খুব বেশি অসুবিধা হয়েছিল। বিমানে যে তেল ব্যবহার করা হয় তার অক্টেন-মান বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়। অল্প তেলে বেশি দূর যাওয়া গেলে আর বার বার মাটিতে নেমে এসে তেল বোঝাই করার হাঙ্গামা থাকে না।

তেলের সিটেন-মান ॥ ডিজেল এঞ্জিনের গঠন ঠিক মোটর এঞ্জিনের মত নয়, কাজেই এতে পেট্রোলের বদলে ডিজেল তেল ব্যবহার করতে হয়। ডিজেল এঞ্জিনে প্রথমে একটি পিস্টন অতিরিক্ত মাত্রায় বায়ু সঙ্কুচিত করে, এতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯০—৩৪০° সেন্টিগ্রেড হয়। এইরূপ সঙ্কোচনের শেষ পর্যায়ে একটা পিচকারির ভিতর দিয়ে খানিকটা ডিজেল তেল প্রবেশ করিয়ে দিলে তা আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে এবং পিস্টনটি উপরদিকে ঠেলে দেয়। এক্ষেত্রে মোটরের এঞ্জিনের মত ব্যাটারির সাহায্যে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করার দরকার হয় না। ডিজেল তেল যত সহজদাহ্য হয় তত ভাল। তেলের অক্টেন-মান খুব কম হলে সহজদাহ্য হয়।

ডিজেল তেল কতটা সহজদাহ্য নিরূপণ করতে হলে তার সিটেন-মান নির্ণয় করা হয়। শতকরা কতভাগ সিটেনের (cetane, $C_{16}H_{34}$) সঙ্গে কতটা ১-মিথাইল ন্যাপ্থ্যালিন (I-methyl naphthalene, $C_{10}H_7.CH_3$) মেশালে তার দাহ্য গুণ পরীক্ষিত ডিজেল তেলের অনুরূপ হয়, তা নির্দ্ধারিত করলে তেলটির সিটেন-মান (cetane-number) জানা যায়। বিশুদ্ধ সিটেনের সিটেন-মান ১০০, আর বিশুদ্ধ ১-মিথাইল ন্যাপ্থ্যালিনের সিটেন-মান শূন্য ধরা হয়।

১২. 'ক্র্যাকিং' বা ভাঙন প্রক্রিয়ায় ভারি তেল থেকে হাল্কা তেল উৎপাদন

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গেসঙ্গে সব দেশে কলকারখানা, মোটরগাড়ি বিমান ইত্যাদির দ্রুত প্রসার হয়েছে, আর সেইসব সচল রাখার জন্য পেট্রোলের চাহিদাও দ্রুত বেড়ে গিয়েছে। খনিজ পেট্রোলিয়ম থেকে পেট্রোলের উৎপাদন বাড়াবার খুব চেষ্টা চলেছে।

পেট্রোল পৃথক করার সময় উচ্চতর স্ফুটনাঙ্ক মাত্রার বিভিন্ন জ্বালানি তেল যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হয়। এইগুলি কিভাবে কাজে লাগান যায়? বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, কেরোসিন, ডিজেল তেল প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনের অণুগুলি বড় ও ভারি। তাদের স্ফুটনাঙ্ক মাত্রাও উঁচু। কোনো উপায়ে এইসব অণু ভেঙে ছোট আর হাল্কা অণুতে পরিণত করতে পারলে উদ্বায়ী পেট্রোলের পরিমাণ বাড়তে পারে। এমন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন হয়েছে যাতে ভারি তেলের অণু ভেঙে হাল্কা উদ্বায়ী তেলের অণুতে পরিণত করা গেছে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'ক্র্যাকিং' বা ভাঙন প্রক্রিয়া (cracking process)।

১৮৬৫ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী ইয়ং এইরূপ ভাঙন প্রক্রিয়ায় ভারি তেল থেকে কেরোসিন তৈরি করে বাজারে চালু করেন। তারপর বার্টন পেট্রোল-জাতীয় পদার্থ তৈরি করলেন ১৯১৩ খৃস্টাব্দে। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১০০ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করে ৩৭০-৪০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় খুব ধীরে ধীরে ভারি তেলের পাতন-ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, এতে ভারি তেলের বেশ খানিকটা অংশ ভেঙে হাল্কা উদ্বায়ী পেট্রোলে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ার আরও উন্নতি হয়েছে। এখন চুল্লীর মধ্যে অবস্থিত সারবন্দী উত্তপ্ত নলের ভিতর দিয়ে (৪৭৫-৫৩০° সেন্টিগ্রেড) প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ২৫০-১০০০ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করে ভারি তেল পাঠানো হয়। যে হাল্কা তেলের উদ্ভব হয় তার উদ্বায়ী অংশ পৃথক করে নিয়ে পেট্রোল রূপে ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে হাউড্রি দেখেন সিলিকা-অ্যালুমিনা (silica-alumina) প্রভাবকের (catalyst) সংস্পর্শে ভারি তেল আরও সহজে ভেঙে যায়। সেক্ষেত্রে ৫০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মাত্র ৩০ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করলেই কাজ হয়। এই প্রক্রিয়ার আর-একটা সুবিধা এই যে, এতে গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ কম ও তরল পেট্রোলের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। এক বছর পরে সিলিকা ও অ্যালুমিনা মিশ্রণের প্রভাবক শক্তি অনেক কমে যায়। এই

মিশ্রণ আগুনে পুড়িয়ে নিলে আবার তার প্রভাবক শক্তি ফিরে আসে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য কিছুদিন হল হাউড্রি প্রক্রিয়ার সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন মিশ্রণটি ধীরে ধীরে ভারি তেলের বাষ্পে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ভারি তেল ভেঙ্গে হাল্কা তেলে পরিণত হবার পর যন্ত্রের অন্য এক অংশে প্রভাবকটি উদ্ধার করে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এতে তেলের ভাঙ্গণ প্রক্রিয়া বেশ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় অথচ মিশ্রণটির কার্যকারিতা একটুও কমে না।

১৩. উচ্চতর অক্টেন-মান বিশিষ্ট তেল প্রস্তুতির উপায়

পেট্রোলের অক্টেন-মান যত বেশি হয় জ্বালানি তেল হিসেবে তার মূল্য তত বেশি। হাউড্রি উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ায় প্রথমে ভারি তেলের বৃহত্তর অণুগুলি ভেঙে তা থেকে ক্ষুদ্রতর ওলিফাইন অণুর সৃষ্টি হয়। এইসব ওলিফাইন অণু থেকে ন্যাপ্‌থিনের আর তা থেকে অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। ভাঙন-প্রক্রিয়ায় যে হাল্কা তেল পাওয়া যায় তাতে ওলিফাইন এবং অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে বলে তার অক্টেন-মান বেশি হয়।

অ্যালুমিনা-ক্রোমিয়া (alumina-chromia) প্রভাবকের সংস্পর্শে প্রায় ৬০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অনেক হাইড্রোকার্বন থেকে আংশিকভাবে হাইড্রোজেন বিযুক্ত করা যায়। এইভাবে প্যারাফিন থেকে পাওয়া যায় ওলিফাইন, যেমন, বিউটেন থেকে বিউটিন। আর ন্যাপ্‌থিন থেকে পাওয়া যায় অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন, যেমন, সাইক্লো-হেক্সেন থেকে বেন্‌জিন। উচ্চতর অক্টেন-মান বিশিষ্ট তেল প্রস্তুতির দিক দিয়ে এগুলি খুবই মূল্যবান।

সরল প্যারাফিনের চেয়ে আইসো-প্যারাফিনের অক্টেন-মান বেশি।

অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড—হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (aluminium chloride—hydrogen chloride) প্রভাবকের সংস্পর্শে উচ্চতর চাপ এবং

$$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$$

বিউটেন

$$\downarrow$$

$$CH_3-CH_2-CH=CH_2$$

বিউটিন

$$\text{H}_2\text{C}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_2 \text{ (ring)} \longrightarrow C_6H_6$$

সাইক্লো-হেক্সেন → বেনজিন
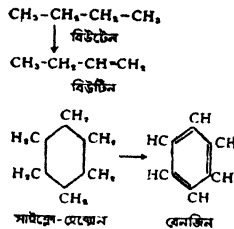
তাপমাত্রায় প্যারাফিন অতি সহজেই আইসো-প্যারাফিনে রূপান্তরিত হয়, যেমন, বিউটেন থেকে পাওয়া যায় আইসো-বিউটেন। ওলিফাইনের বেলায়ও এরূপ রূপান্তর সম্ভব, যেমন, বিউটিন-১ থেকে পাওয়া যায় আইসো-বিউটিন।

$$\underset{\text{বিউটেন}}{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3} \longrightarrow \underset{\text{আইসো-বিউটেন}}{CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}H-CH_3}$$

$$\underset{\text{বিউটিন-১}}{CH_3-CH_2-CH=CH_2} \longrightarrow \underset{\text{আইসো-বিউটিন}}{CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}=CH_2}$$
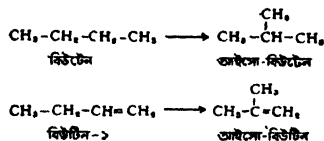
১৯৩৫ সালে ইপাতিয়েফ দুটো ওলিফাইন অণু পরস্পরের সঙ্গে অথবা প্যারাফিন জাতীয় অণু ওলিফাইন জাতীয় অণুর সঙ্গে সংযোজিত করে নূতন অণু সৃষ্টি করার নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করেন। আইসো-প্যারাফিনের অক্টেন-মান বেশি, কাজেই বিজ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য যাতে আইসো-বিউটিন অথবা আইসো-বিউটেন থেকে নানাবিধ আইসো-প্যারাফিন তৈরি করা যায়।

সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড, ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড (phosphoric acid), ধাতুজাত পাইরোফস্‌ফেট (metal pyrophoshate) অথবা বোরন ফ্লুওরাইড (boron fluoride) প্রভাবক রূপে ব্যবহার করে, উচ্চতর চাপ ও তাপ মাত্রায়

এই প্রক্রিয়া অতি সহজেই সম্পাদন করা যায়। এভাবে আইসো-বিউটিন থেকে পাওয়া যায় আইসো-অক্টিন আর তাকে হাইড্রোজেনায়িত করলে পাওয়া যায় আইসো-অক্টেন,—মোটর এঞ্জিনের এটি শ্রেষ্ঠ জ্বালানি তেল। আইসো-বিউটেনের সঙ্গে ইথিন সংযোজিত হলে উদ্ভূত হয় নিও-হেক্সেন (neo hexane)। আর আইসো-বিউটেনের সঙ্গে আইসো-বিউটিন সংযোজিত করলে উদ্ভূত হয় আইসো-অক্টেন।

$$\underset{\text{আইসো-বিউটিন}}{CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}=CH_2} + CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}=CH_2 \longrightarrow \underset{\text{আইসো-অক্টিন}}{CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}}}}-CH_2-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}=CH_2}$$

$$\downarrow + H_2$$

$$\underset{\text{আইসো-অক্টেন}}{CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}}}}-CH_2-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}H}-CH_3}$$

$$CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}H}}}+CH_2=CH_2 \longrightarrow \underset{\text{নিও-হেক্সেন}}{CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}}}}-CH_2-CH_3}$$

$$\underset{\text{আইসো-বিউটেন}}{CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}H}}}} + \underset{\text{আইসো-বিউটিন}}{CH_2=\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}-CH_3} \longrightarrow \underset{\text{আইসো-অক্টেন}}{CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}}}}-CH_2-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}H}-CH_3}$$
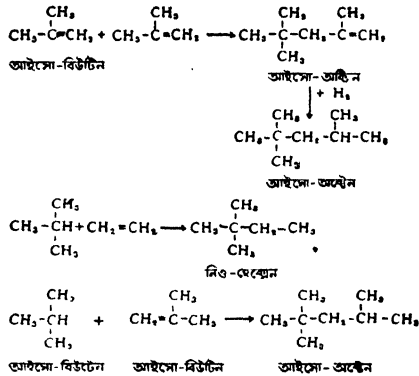
কৃত্রিম উপায়ে আইসো-অক্টেন প্রস্তুত করতে হলে যে উপাদানগুলির প্রয়োজন—যেমন, আইসো-বিউটেন, আইসো-বিউটিন ইত্যাদি—সেগুলি পূর্বোক্ত যে কোনো প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়ম থেকেই তৈরি করা যায়, তাই আজকাল আইসো-অক্টেন তৈরি করা আর শক্ত নয়।

১৯২২ সালে মিজ্‌লে ও বয়েড বললেন পেট্রোলের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ টেট্রা ইথাইল লেড (tetra ethyl lead) সংক্ষেপে 'টি. ই. এল.' (TEL) মেশালে তার অক্টেন-মান অনেক বেড়ে যায়। আজকাল পেট্রোলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ 'টি. ই.এল' মিশিয়ে তার অক্টেন-মান বাড়িয়ে

বাজারে বিক্রি করা শুরু হয়েছে। 'লেড' (lead) বা সীসে জীবদেহের পক্ষে বিষাক্ত বলে 'টি. ই.এল' যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলে না—আইনসঙ্গত ভাবে মোটরের পেট্রোলের জন্য গ্যালন প্রতি ৩ ঘন সেন্টিমিটার (cubic centimeter) 'টি. ই. এল' মেশানো চলে। বিমান সুউচ্চ বায়ুপথে চলাচল করে বলে তাতে ব্যবহৃত পেট্রোল থেকে লোকালয়ের বাতাস বিষাক্ত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে, এজন্য বিমানে ব্যবহার্য তেলে প্রতি গ্যালনে ৪ ঘন সেন্টিমিটার 'টি. ই. এল' মিশিয়ে অক্টেন-মান আরও বাড়ানো হয়েছে।

আজকাল বিমানে ব্যবহৃত ১০০-অক্টেন-মান বিশিষ্ট আদর্শ পেট্রোলে মেশান থাকে—

আইসো-অক্টেন	শতকরা	৪০ ভাগ
আইসো-পেণ্টেন	শতকরা	২৫ ভাগ
সাধারণ পেট্রোল	শতকরা	৩৫ ভাগ
টি. ই. এল	গ্যালন প্রতি	৪ ঘন সেন্টিমিটার

১৪. কৃত্রিম জ্বালানি তেল

জার্মানিতে তেলের খনি নেই। প্রয়োজনীয় পেট্রোলের জন্য যাতে সব সময়ে অন্যান্য তৈলপ্রসূ দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকতে হয় সেজন্য সে দেশের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে জ্বালানি তেল তৈরি করার চেষ্টা বহুদিন ধরে করেছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানিকে অনেকাংশে এইরূপ কৃত্রিম পেট্রোলের উপরে নির্ভর করতে হয়েছিল।

বার্জিয়াস প্রক্রিয়া (Bergius Process) ॥ কয়লা চূর্ণ এবং আলকাতরার সঙ্গে খুব সামান্য আয়রন অক্সাইড (iron oxide) মিশিয়ে এবং প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩০০০ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করে ৪৫০।৫০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়

হাইড্রোজেনায়িত করলে একটি তরল পদার্থের উদ্ভব হয়। এ থেকে পেট্রোল-জাতীয় জ্বালানি তেল পৃথক করে নেওয়া যায়। ১½ বা ২ টন কয়লা থেকে এভাবে প্রায় ১ টন পেট্রোল পাওয়া যায়। এই পেট্রোলের অক্টেন-মান ৭৫ থেকে ৮০।

ফিসার-ট্রপ্‌স প্রক্রিয়া (Fischer-Tropsch Process)॥ উত্তপ্ত কয়লার মধ্য দিয়ে জলীয় বাষ্প পাঠালে হাইড্রোজেন ও কার্বন মনক্সাইড (carbon monoxide) গ্যাসের মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই গ্যাস মিশ্রণের চলতি নাম 'ওয়াটার গ্যাস' (water gas) বা জল-গ্যাস। ১৯৩৩ সালে ফিসার ও ট্রপ্‌স 'ওয়াটার গ্যাস'কে হাইড্রোজেনায়িত করে তা থেকে কৃত্রিম জ্বালানি তেল প্রস্তুতির একটা নূতন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। ওয়াটার গ্যাস মিশ্রণে আরও হাইড্রোজেন গ্যাস মেশান হয়, যাতে প্রতি দুই ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ কার্বন মনক্সাইড গ্যাস মিশে থাকে। মিশ্রণটিকে আয়রন অক্সাইডের উপর দিয়ে প্রবাহিত করে তা থেকে অবাঞ্ছিত গন্ধক দূর করে নেওয়া হয়। এবারে ২০০° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নিকেলের (nickel) সংস্পর্শে হাইড্রোজেনায়িত করলে তরল জ্বালানি তেল পাওয়া যায়। এ থেকে যে পেট্রোল পৃথক করা হয় তার অক্টেন-মান মাত্র ৪০, কাজেই এর সঙ্গে উচ্চতর অক্টেন-মান বিশিষ্ট তেল এবং 'টি. ই. এল' মিশিয়ে তার পর ব্যবহার করা চলে। এই সঙ্গে যে ডিজেল তেল পাওয়া যায় তার সিটেন-মান খুব বেশি।

১৯৪০ সালে জার্মানিতে বার্জিয়াস-প্রক্রিয়ায় প্রায় ২½ কোটি ব্যারেল এবং ফিসার-ট্রপ্‌স প্রক্রিয়ায় প্রায় ১৬ কোটি ব্যারেল কৃত্রিম জ্বালানি তেল প্রস্তুত করা হয়। ভারতে পেট্রোলিয়মের একান্ত অভাব থাকলেও কয়লার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে কয়লা থেকে কৃত্রিম জ্বালানি তেল উৎপাদন করে এদেশের পেট্রোলের অভাব মেটানো যাবে।

১৫. প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাস

প্রাচীন কাল থেকে কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে সহজদাহ্য প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান জানা ছিল। 'মাড্ ভল্‌কানো' গুলিতে দাহ্যগ্যাস সঞ্চিত থাকে। তৈল আহরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আগেকার দিনে এই মূল্যবান জ্বালানি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। আজকাল পেট্রোলে হিদা যেমন বাড়ছে তেলের খনিগুলি তেমনি দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে। তাই আজ প্রকৃতির বুকে সঞ্চিত মূল্যবান দাহ্যগ্যাসের সদ্ব্যবহারের সর্ববিধ চেষ্টা চলছে।

ভূগর্ভে দাহ্য গ্যাস ও তরল পেট্রোলিয়ম প্রায়ই একসঙ্গে থাকে। সব আগে থেকে ব্যবস্থা করে নিয়ে নলকূপ না বসালে এই গ্যাস দারুণ বেগে বেরিয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যায়। এমন অনেক তৈলখনি পাওয়া গেছে যেখান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস বেরিয়ে যাবার পর অতি সামান্য পেট্রোলিয়মই আহরণ করা গেছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আজকাল নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। তৈলক্ষেত্রের অনেক এঞ্জিন ও বয়লার (boiler) ইত্যাদি চালু রাখার জন্য এই গ্যাসের আগুন জ্বালানো হয়। স্বল্প পরিমাণ বায়ুর সংস্পর্শে এই গ্যাস জ্বালিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ভুসো কালি তৈরি করা হয়। এই কালি দিয়ে ছাপাখানার কালি, জুতোর পালিস, বার্নিস, কলের গানের রেকর্ড প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করা হয়।

চাপ ও শৈত্যের প্রভাবে এই গ্যাসের খানিকটা অংশ তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। এর চলতি নাম মোটর স্পিরিট (motor-spirit)। অত্যন্ত উদ্বায়ী বলে একে অপেক্ষাকৃত অনুদ্বায়ী তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মোটরের পেট্রোল রূপে ব্যবহার করা হয়।

১৬. তৈলবাহী শেল

খনিজ তৈলশিল্প এবং শেলজাত তৈলশিল্প একই সময়ে শুরু হল। অল্পদিনের মধ্যেই পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদির উৎপাদন আশাতীত রকম বেড়ে গেল। শেল-জাত তেলের উৎপাদন কিন্তু কমে গেল। তৈলবাহী শেল খনি থেকে উত্তোলন করে চোলাই করলে জ্বালানি তেল পাওয়া যায়। তাই শেল থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদনের খরচ খুব বেশি পড়ে। শেল থেকে তেল উৎপাদনের খরচ বেশি হলেও এ থেকে যে অ্যামোনিয়া (ammonia) গ্যাস পাওয়া যায় তা দিয়ে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট (ammonium sulphate) নামক কৃত্রিম সার তৈরি করা হয়।

তৈলবাহী শেল দেখতে গাঢ় পাটকিলে, ব্রাউন বা হল্‌দে-ব্রাউন রঙের। কঠিন পদার্থ হলেও মোমের মত নরম। সহজে ছুরি দিয়ে কাটা যায়। কয়লার মত, শেল ভূগর্ভে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে।

শেলের অবস্থান ॥ স্কটল্যাণ্ডের লোথিয়ান ও টরবেন অঞ্চলে প্রচুর শেল পাওয়া যায়। এই শেল থেকে টন প্রতি ২০।৩০ গ্যালন তেল এবং ৬০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের নরফোক এবং কিমারিজ অঞ্চলেও উৎকৃষ্ট শেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এখানকার তেলে গন্ধকের মাত্রা খুব বেশি থাকায় (শতকরা ৮ ভাগ) তেল পরিশোধন করে ব্যবহারোপযোগী করা কষ্টসাধ্য।

ফ্রান্সের আতুঁ অঞ্চলে বহুকাল যাবৎ শেল-জাত তেল উৎপাদন করা হচ্ছে। এখানকার শেল থেকে টন প্রতি ৫০ গ্যালন তেল পাওয়া যায়।

এস্‌থোনিয়ার শেল খুব উৎকৃষ্ট এবং টন প্রতি প্রায় ৭৫ গ্যালন তেল পাওয়া যায়। কিছুদিন হল এখানকার শেল থেকে গ্যাস এবং তেল উৎপাদন শুরু হয়েছে।

কানাডার নিউব্রুনস্‌উইক, নোভাস্কটিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে শেল আবিষ্কৃত হয়েছে। নিউব্রুনস্‌উইকের শেল থেকে টন প্রতি ২৭।৫৭ গ্যালন তেল এবং ৩০।১১০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট পাওয়া যায়। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড অঞ্চলের শেলও খুব ভালো, এ থেকে টন প্রতি ৫০ গ্যালন তেল এবং ৮০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো, উটা, কেণ্টুকি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর শেল পাওয়া যায়। উটা অঞ্চলের শেল থেকে টন প্রতি ৩৫ গ্যালন তেল এবং কেণ্টুকি অঞ্চলের শেল থেকে টন প্রতি ২২ গ্যালন তেল ও ৯৭ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট পাওয়া যায়।

এ-ছাড়া আফ্রিকার ট্রান্সভাল অঞ্চলে এবং ব্রেজিল, চীন, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও প্রচুর তৈলবাহী শেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। আজও সেগুলি ব্যবহার করা হয় নি। অবস্থান অনুসারে শেল-জাত তেলের পরিমাণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

তালিকা ৯। বিভিন্ন দেশের তৈলবাহী শেল

দেশ	টন প্রতি তেলের উৎপাদন	টন প্রতি অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেটের উৎপাদন
স্কটল্যাণ্ড	২০-৩০ গ্যালন	৭-৬০ পাউণ্ড
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	৮০ গ্যালন	—
এস্‌থোনিয়া	৭৫ গ্যালন	—
কানাডা	২৭-৫৭ গ্যালন	৩০-১০০ পাউণ্ড
যুক্ত রাষ্ট্র	২২-৩৫ গ্যালন	১৭-৯৭ পাউণ্ড
ট্রান্স্‌ভাল	২৮ গ্যালন	—

শেল-জাত দ্রব্যাদির উৎপাদন॥ শেল চোলাই করে দাহ্য গ্যাস, তেল ও অ্যামোনিয়া গ্যাস পাওয়া যায়। শীতল করে তেলের অংশ পৃথক করা

হয়। সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড সাহায্যে অ্যামোনিয়া শোষণ করে নেওয়া হয়। অবশিষ্ট দাহ্য গ্যাস জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয়। অ্যামোনিয়া গ্যাস সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হলে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেটের উদ্ভব হয়।

১৭. অ্যাস্‌ফাল্ট

গুড়ের মত চট্‌চটে অবস্থায় অ্যাস্‌ফাল্ট পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন বায়ুর সংস্পর্শে থাকলে অ্যাল্‌ফাল্ট ক্রমশ শক্ত হয়ে ওঠে। এটি পেট্রোলিয়ম-জাত পদার্থ বলে মনে হয়। আমেরিকা এবং মেক্সিকো অঞ্চলের পেট্রোলিয়ম চোলাই করলে যে অর্ধ কঠিন অংশ পড়ে থাকে তা অ্যাসফাল্টের অনুরূপ। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন বহুপূর্বে ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ম সৃষ্টি হবার পর প্রাকৃতিক কারণে উদ্বায়ী তেল বাষ্পীভূত হয়ে গেছে এবং অনুদ্বায়ী অ্যাস্‌ফাল্ট পড়ে আছে। প্রাকৃতিক অ্যাস্‌ফাল্ট অথবা পেট্রোলিয়ম-জাত অ্যাস্‌ফাল্ট পাকা রাস্তা তৈরির জন্য ব্যবহার হয়।

প্রাকৃতিক অ্যাস্‌ফাল্টের সুবৃহৎ হ্রদ বারমুদেজ ও ত্রিনিদাদে আছে। সাইবেরিয়ার সাখালিন দ্বীপেও এইরূপ হ্রদ দেখা গেছে। ফ্রান্স, গ্রীস, প্যালেস্টাইন, মেক্সিকো, ক্যালিফোর্নিয়া, কেন্টকি, উটা প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রচুর অ্যাস্‌ফাল্ট আছে। ভারতের হিমালয় অঞ্চলেও অ্যাস্‌ফাল্টের সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৮. ভারতে পেট্রোলিয়ম অনুসন্ধান

বর্তমান ভারত সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ নানাস্থানে পেট্রোলিয়মের সন্ধান করে ফিরছেন। জ্বালামুখী আমাদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে অম্বিকা দেবীর মন্দিরে অবস্থিত কুণ্ড থেকে অবিরত দাহ্য গ্যাস বের হয়। বিজ্ঞানীদের মতে এই গ্যাস পেট্রোলিয়ম উদ্ভূত।

কলকাতার একটি তৈল প্রতিষ্ঠান আসামের খাসি স্টেটে তৈল-উৎপাদনের জন্য জমি জমা নিয়েছেন। এখানে পাহাড়ের ফাটলের পথে নির্গত দাহ্য গ্যাস আর তার সঙ্গে পেট্রোলিয়মের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে অনুমান হচ্ছে অনেকগুলি খুব গভীর নলকূপ বসালে তবেই তেল-সংগ্রহ সম্ভব হবে।

ভারত সরকারের রিপোর্টে প্রকাশ ভূ-বিজ্ঞানীরা নাগা পাহাড়ে পেট্রোলিয়মের সন্ধান পেয়েছেন।

নেপালের ওখাল্‌ডোঙ্গা পাহাড়ের কাছে পেট্রোলিয়মের সন্ধান পাওয়া গেছে। চারটি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এই জায়গা এক শ বছরের জন্য জমা নিয়েছেন। অনুমান এখান থেকে প্রতিদিন ৫০০ গ্যালন তেল পাওয়া যাবে।

—

পরিভাষা

Acid—অ্যাসিড
Algae—শ্যাওলা
Alicyclic—অ্যালিসাইক্লিক
Aliphatic—অ্যালিফ্যাটিক
Alkali—ক্ষার
Anticline—কুব্জভাঁজ
Aromatic—অ্যারোম্যাটিক
Asphalt—অ্যাস্‌ফাল্ট
Atom—পরমাণু
Bacteria—ব্যাক্‌টিরিয়া
Barrel—ব্যারেল, পিপে
Bitumen—বিটুমেন, সহজদাহ্য খনিজ পদার্থ (দাহ্যগ্যাস, পেট্রোলিয়ম, অ্যাস্‌ফাল্ট ইত্যাদি সবই এর অন্তর্গত)
Boiler—বয়লার
Boiling point—স্ফুটনাঙ্ক
Carbohydrate—কার্বোহাইড্রেট
Carbon black—ভুসো কালি
Catalyst—প্রভাবক
Cetane-number—সিটেন-মান
Charcoal—অঙ্গার
Chlorophyll—ক্লোরোফিল
Coal gas—কোলগ্যাস, কয়লা-গ্যাস
Compound—যৌগিক পদার্থ, যৌগ
Compression ratio—সঙ্কোচন মাত্রা
Cracking process—ক্র্যাকিং বা ভাঙন প্রক্রিয়া
Cubic centimeter—ঘন সেণ্টিমিটার
Dehydrogenation—হাইড্রোজেন বিযুক্তকরণ
Derrick—ডেরিক বা কাঠামো
Diatom—ডাই-এটম
Distillation—পাতন-প্রক্রিয়া, চোলাই করা
Double bond—দ্বিবন্ধ
Earth movement—ভূসংক্ষোভ
Element—মৌলিক পদার্থ, মৌল
Engine—এঞ্জিন
Fault—স্তরচ্যুতি
Fertilizer—সার
Filter press—ফিল্টার প্রেস (অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ ক'রে খুব ঘন তরল পদার্থ ছাঁকবার যন্ত্র)
Formula—সঙ্কেত
Fossil—জীবাশ্ম
Fractional distillation—আংশিক পাতন-প্রক্রিয়া
Gallon—গ্যালন
Haemin—হিমিন
Hydrocarbon—হাইড্রোকার্বন

Hydrogenation—হাইড্রোজেনায়িতকরণ
Inorganic—অজৈব
Iso-paraffin—আইসো-প্যারাফিন
Kerosene—কেরোসিন
Lime-stone—চুনাপাথর
Liquid paraffin—তরল প্যারাফিন
Lubricating oil—পিচ্ছিলকারী তেল
Melting point—গলনাঙ্ক
Migration—স্থান পরিবর্তন
Molecular weight—আণবিক ভার
Molecule—অণু
Motor spirit—মোটর স্পিরিট
Mud volcano—মাটির আগ্নেয়গিরি
Naphthene—ন্যাপ্থিন
Natural gas—প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাস
Octane-number—অক্টেন-মান
Oilfield—তৈলক্ষেত্র
Oil shale—তৈলবাহী শেল
Oil well—তৈল কূপ
Olefine—ওলিফাইন
Organic—জৈব
Paraffin—প্যারাফিন
Petrol—পেট্রোল
Petroleum—পেট্রোলিয়ম
Pipe-line—পাইপলাইন, নলপথ
Piston—পিস্টন
Plankton—প্ল্যাংক্টন
Protein—প্রোটিন
Residue—অবশেষ
Retort—বকযন্ত্র
Rock oil—পাথুরে তেল, খনিজ তেল, পেট্রোলিয়ম
Sand-stone—বেলেপাথর
Saturated—পরিপৃক্ত
Sedimentary rock—পলি-পাথর
Seismograph—সিস্‌মোগ্রাফ, ভূ-কম্পন-লেখক যন্ত্র
Shale—শেল
Solid paraffin—কঠিন প্যারাফিন, মোম
Spark—স্ফুলিঙ্গ
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব
Straight chain—সরল শৃঙ্খল
Structural formula—সংযুতি সঙ্কেত
Sweating process—প্রস্বেদন প্রক্রিয়া
Tank—তৈলাধার
Temperature—উষ্ণতা, তাপমাত্রা
Theory—মতবাদ
Torsion balance—টর্সন ব্যালান্স
Unsaturated—অপরিপৃক্ত
Valency—যোজ্যতা
Valency bond—যোজক
Water gas—ওয়াটার গ্যাস, জল-গ্যাস

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

* সচিত্র

*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮। উপনিষদ্ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
৬১। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬২। ভারতশিল্পে মূর্তি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর
৬৬। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৬৭। শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০। সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৭১। দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২। তেল আর ঘি ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৮৩। বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৪। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৫। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৮৬। গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৭। রসাঞ্জন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

* সচিত্র

* সচিত্র

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

এই গ্রন্থমালার জন্য বিশ্বভারতী জাতীয় অভিনন্দন লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। —যুগান্তর

প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। বিশ্বভারতী বাংলাদেশে সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন। —দেশ

সহজ গ্রন্থমালার যে ক'টি গুণ তার প্রায় সবগুলিই এখানে বর্তমান; চেহারায় আশ্চর্য আকর্ষণ, দাম অত্যন্ত সস্তা, ছাপা ঝকঝকে পরিষ্কার। —সংকেত

অল্প কথায় অনেক কথা ব'লে নীরসকে অমৃত করা হয়েছে, এমন গ্রন্থ পেতে হলে এই সিরিজের দিকে তাকাতে হয়। —পূর্বাশা

আমাদের ইস্কুল-কলেজের ভ্রমাত্মক শিক্ষার পরিপূরক ও সংশোধক রূপে এ ধরনের বই যত বেশি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় ততই ভালো। —কবিতা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ নামক যে গ্রন্থমালার আয়োজন করিয়াছেন তাহা দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার ও জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করিবে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালা নিশ্চিতই জনপ্রিয় হইবে এবং দেশের কল্যাণ সাধন করিবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালা বিষয় ও লেখক নির্বাচনে, মুদ্রণের পারিপাট্যে, মলাটের সৌষ্ঠবে যে প্রকাশন-দক্ষতার পরিচয় দেয়, বাংলাদেশে তা অভূতপূর্ব। —পরিচয়

॥ এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে ১১২ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে
পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে ॥

প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা